সমাজ সেবক পুস্তকাবলী—৪

হিন্দুর উপাসনাতত্ত্ব-দ্বিতীয় ভাগ।

ঈশ্বরের উপাসনা।

কালীচরণ সেন বি, এল্

প্রণীত।

গৌহাটী সনাতনধর্ম্মসভা হইতে সহকারিসম্পাদক

শ্রীরামদেব শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

PRINTED BY SHIBAPADA GHOSH-BARMAN

AT

THE BANIK PRESS

60, Mirzapur Street, Calcutta.

উৎসর্গ

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমংতপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥

স্বর্গত পরমারাধ্য পিতৃদেবের প্রীতি কামনায়
তাঁহার পুণ্যময় পবিত্র নামে
তদীয় অকিঞ্চন তনয়
কর্ত্তৃক

হিন্দুর উপাসনাতত্ত্ব

ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত
উৎসর্গীকৃত হইল।

নিবেদন ।

সমাজসেবক পুস্তকাবলীর চতুর্থ সংখ্যায় হিন্দুর উপাসনাতত্ত্ব দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। এই ভাগে ঈশ্বরের উপাসনা বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। শাস্ত্র অবলম্বনে বিষয়গুলি বিবৃত করিতে যত্নবান্ হইয়াছি ; শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে কতদূর সমর্থ হইয়াছি, তাহা ভক্তিপ্রাণ সুধীগণ বিচার করিবেন। সমাজ সেবাই আমাদের উদ্দেশ্য, হিন্দু সমাজের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হইলেই শ্রম সার্থক মনে করিব। এই গ্রন্থের কিয়দংশ হিন্দু পত্রিকা ও সাহিত্য সংবাদে মুদ্রিত হইয়াছিল।

পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয়ের লিখিত ভবৌষধ নামক গ্রন্থ ও অন্যান্য প্রবন্ধাবলী হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছি। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের ভক্তি যোগ হইতেও কিয়ৎপরিমাণে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

অবশেষে বিশেষ কৃতজ্ঞতা সহকারে উল্লেখ করিতেছি যে এই গ্রন্থের প্রুফ্‌শিট সংশোধন সম্বন্ধে কটন কলেজের সিনিয়ার সংস্কৃতাধ্যাপক পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্ব-সরস্বতী মহোদয় আমার বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য ও উপদেশ না পাইলে এ গ্রন্থ মুদ্রিত হইত কিনা সন্দেহ।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুর (কামরূপ)
১৮৩৬ শক।

গ্রন্থকার।

গৌহাটি-বাল্যাশ্রম

স্তোত্র

নমস্তস্মৈ মহেশায়
যস্য সন্ধ্যাত্রয়চ্ছলাৎ
যাতায়াতং প্রকুর্ব্বন্তি
ত্রিজগৎপতয়োঽনিশম্ ॥

—০ঃ০—

নমো ধরণিরূপায় নমঃ সলিলমূর্ত্তয়ে।
নমো দহনরূপায় নমো মারুতমূর্ত্তয়ে।
নমোঽস্তু ব্যোমরূপায় যজমানাত্মনে নমঃ ॥
নমো হিমাংশুরূপায় নমো ভাস্করমূর্ত্তয়ে।
সর্ব্বভূতান্তরস্থায় শঙ্করায় নমো নমঃ ॥
শ্রুত্যন্তর্গতবাসায় শ্রুতয়ে শ্রুতিজন্মনে।
অতীন্দ্রিয়ায় মহসে শাশ্বতায় নমো নমঃ ॥
স্থূলসূক্ষ্মবিভাগাভ্যামনির্দ্দেশ্যায় শম্ভবে।
ভবায় ভবভূতায় দুঃখহন্ত্রে নমোঽস্তু তে ॥

তর্কমার্গায় ভূতানাং তপসাম্ফলদায়িনে।
চতুর্ব্বর্গবদান্যায় সর্ব্বজ্ঞায় নমো নমঃ॥
আদিমধ্যান্তশূন্যায় নিরস্তাশেষভীতয়ে।
যোগিধ্যেয়ায় মহতে নির্গুণায় নমো নমঃ॥
বিশ্বাত্মনেঽবিচিন্ত্যায় বিলসচ্চন্দ্রমৌলয়ে।
কন্দর্পদর্পনাশায় কালহন্ত্রে নমো নমঃ॥
বিষাশনায় বিহরদ্বৃষস্কন্ধমুপেয়ুষে।
সরিদ্দামসমাবদ্ধকপর্দ্দায় নমো নমঃ॥
শুদ্ধায় শুদ্ধভাবায় শুদ্ধানামন্তরাত্মনে।
পুরান্তকায় পূর্ণায় পুণ্যনাম্নে নমো নমঃ॥
তুষ্টায় নিজভক্তানাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে।
নির্ব্বাসসেঽনিবাসায় বিশ্বশাস্ত্রে নমো নমঃ॥
ত্রিমূর্ত্তিমূলভূতায় ত্রিনেত্রায়াদিসম্ভবে।
ত্রিধাম্নাং ধামরূপায় জন্মঘ্নায় নমো নমঃ॥
দেবাসুরশিরোরত্নকিরণারুণিতাঙ্ঘ্রয়ে।
কান্তায় নিজকান্তায়ৈ দত্তার্দ্ধায় নমো নমঃ॥

"রাধা কৃষ্ণ মানো আর নাই মানো, এই টানটুকু লও। ভগবানের জন্য কিসে একরূপ ব্যাকুলতা হয় তাহার জন্য চেষ্টা কর, ব্যাকুলতা হ'লেই তাঁকে লাভ করা যায়।"

—রামকৃষ্ণ পরমহংস।

Mohila Press, Calcutta.

হিন্দুর উপাসনাতত্ত্ব।

ঈশ্বরের উপাসনা।

উপাসনার আবশ্যকতা বুঝিতে হইলে উপাসনা জিনিষটা কি, তাহা জানা চাই। শাস্ত্র বলেন

"উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়ক-মানসব্যাপাররূপাণি" (বেদান্তসার)

সগুণ ব্রহ্মের প্রতি মনের ক্রিয়া বিশেষের নাম 'উপাসনা'।

ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকরণে দেখিয়াছি সগুণ ও নির্গুণ ভেদে ব্রহ্মের দুই প্রকার ভাব শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। যাহা সগুণ, তাহাই ঈশ্বর-পদবাচ্য ও আকারবান্; এই আকার অনন্ত ও অপরিসংখ্যেয়; ইহার যে কোন একটি অবলম্বন করিয়া মানসিক ক্রিয়াবিশেষের নাম উপাসনা।

'উপাসনা' শব্দের ধাত্বর্থ—অতি সন্নিধানে থাকা। উপ এই উপসর্গের অর্থ—সন্নিধি এবং আস ধাতুর অর্থ—থাকা। "ঈশ্বর-উপাসনা" বলিলে তাঁহার সন্নিধানে অবস্থিতি করা বুঝিতে হইবে।

জগদম্বা এই ত্রিভুবনে ওতঃপ্রোত ভাবে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার অভাব কুত্রাপি নাই। তিনি আমাদের শরীরের বাহিরে ভিতরে প্রতি পরমাণুতে বিদ্যমানা। তিনি ঋগ্বেদীয় শ্রীদেবীসূক্তে নিজেই বলিয়াছেন—

"অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিমা সম্বভূব॥"

তিনি নিজেই এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়া ইহার অন্তর-বাহিরে বায়ুর ন্যায় বিরাজ করিতেছেন, পৃথিব্যাদি সমস্ত লোকেই নিজ মহিমার সহিত অধিষ্ঠিতা আছেন।

তিনি যখন এই ব্রহ্মাণ্ডে সমস্তের মধ্যে বিরাজিতা, তখন তাঁহার দূরে বা বাহিরে কিছু থাকিতে পারে না। এ ভাবে আমরা সকলেই তাঁহার অতি সন্নিহিত আছি; ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার কাছ ছাড়া হইতে পারি না। তিনি আপন শক্তি দ্বারা আমাদিগকে শক্তিমান্ করিতেছেন এবং আপন চৈতন্য দ্বারা আমাদিগের চৈতন্য সম্পাদন করিতেছেন। কিন্তু উপাসনা অর্থ একপ সন্নিধানে অবস্থিতি করা নহে। উপাসনার তাৎপর্য্যার্থ, মনে মনে সন্নিধানে থাকা, তাঁহার ধ্যানে, তাঁহার ভাবে মনে প্রাণে মগ্ন হইয়া থাকা; তাঁহার সত্তায় নিজসত্তাকে ডুবাইয়া দেওয়াই উপাসনা-শব্দের লক্ষ্য। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের এরূপ অবস্থা না হইবে, ততদিন আমরা তাঁহার মধ্যে থাকিয়াও "দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ"। যখন আমরা অন্তরে অন্তরে তাঁহাকে ধরিতে পারিব, তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিব এবং তাঁহার ভাব সাগরে নিজের অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিতে পারিব, তখনই তাঁহার সন্নিধান হইবে। ইহাই "সগুণব্রহ্ম-বিষয়ক মানস-ব্যাপার"। তাঁহার প্রতি এই প্রকার মনের ক্রিয়াই প্রকৃত উপাসনা। যিনি যে পরিমাণে নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব ও কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিহার পূর্ব্বক তাঁহার সত্তায় নিজকে ডুবাইয়া দিতে পারিবেন, তিনি উপাসনা রাজ্যেও সেই পরিমাণে উন্নত ও অগ্রসর হইবেন। ভাষ্যকার ছান্দোগ্য শ্রুতির প্রারম্ভে উপাসনার একটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—

উপাসনং তু যথাশাস্ত্র সমর্পিতং কিঞ্চিদাবলম্বন মুপাদায় তস্মিন্ সমান-চিত্তবৃত্তিসন্তানলক্ষণম্।

যথাশাস্ত্র কোন অবলম্বন গ্রহণ করিয়া তাহাতে চিত্তবৃত্তি তন্ময় করাকে উপাসনা বলে।

এক্ষণে আমাদিগকে প্রথম দেখিতে ও বুঝিতে হইবে, এভাবে নিজের সত্তাকে তাঁহার সত্তায় ডুবাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন কি? যদি আমরা ইহার আবশ্যকতা বুঝি, তাহা হইলে কি উপায়ে এই ভাব-সাগরে ডুবিতে পারি, তাহা আলোচনা করা যাইবে।

উপাসনার আবশ্যকতা।

আর্য্যশাস্ত্র অনুসারে জীবের সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি। আমরা বহু সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং ইহার পরেও করিব। ভগবান্ গীতায় এই সত্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ ৪র্থ অঃ ৫ শ্লোক।

হে অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি সমস্তই অবগত আছি। কিন্তু হে পরন্তপ! তোমার জ্ঞান-শক্তি আবৃত থাকায় তুমি তাহার কিছুই জানিতেছ না।

জীব, কর্ত্তৃত্বাভিমান বশতঃ অর্থাৎ "আমি করিতেছি আমিই কর্ম্মের কর্ত্তা" এইরূপ অহং ভাবাপন্ন হইয়া সংসারে যে সকল কর্ম্ম করিতেছে, তদ্দ্বারা সে বদ্ধ হইয়া জন্মজন্মান্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। এইপ্রকার কর্ম্মই আমাদের সংসারচক্রে বারংবার আবর্ত্তনের কারণ। যে পর্য্যন্ত এই কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে, সেই কাল পর্য্যন্ত জীব সাংসারিকবিষয়ে সুখ খুজিয়া বেড়ায় এবং "আমি সুখী আমি দুঃখী"—এই প্রকার অনুভব করে। 'আমিই কর্ম্মের কর্ত্তা' এইরূপ বুদ্ধিতে আমরা কর্ম্ম করিলেই সেই কর্ম্মের বীজ সংস্কাররূপে আমাদের জীবাত্মায় সঞ্চিত হয়; পরে উদ্দীপক

কারণ পাইলেই ঐ ক্রিয়ার সংস্কারগুলি পুনরায় কার্য্যোন্মুখ হয়। যেমন বাহ্য জগতে কিছুই একেবারে নষ্ট হয় না, অবস্থান্তরিত হয় মাত্র, সেইরূপ অন্তর্জগতেও কোন চিন্তা বা ভাব কিছুই নষ্ট হয় না।

ন নশ্যতি কৃতং কর্ম্ম সদা পঞ্চেন্দ্রিয়ৈরিহ।
তে হ্যস্য সাক্ষিণো নিত্যং ষষ্ঠ আত্মা তথৈবচ।

মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব অঃ ৭

পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃত কর্ম্ম নষ্ট হয় না। মন ও ইন্দ্রিয়গণ তাহার সাক্ষী স্বরূপ থাকে। মানবের মনে কোনও ভাব উদিত হইলেই তাহার একটী চিত্র চিত্তে অঙ্কিত হয়। সংস্কারের সমষ্টির ন্যায় চিত্ত অনাদিকাল হইতে সংস্কাররাশি দ্বারা চিত্রিত হইতেছে; মন এই সকল চিত্রকে জন্মজন্মান্তরে বহন করে। এই কর্ম্মজনিত চিত্র বা সংস্কার জন্মান্তর প্রাপ্তির কারণ। কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল উৎপাদিত হইবে; কর্ম্মের সহিত কর্ম্মফলের ছায়াতপের ন্যায় সম্বন্ধ।

যথা ছায়াতপৌ নিত্যং সুসম্বদ্ধৌ নিরন্তরম্।
তথা কর্ম্মচ কর্ত্তাচ সম্বদ্ধাবাত্মকর্ম্মভিঃ॥

মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব অঃ ১। ৭৫

ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় কর্ম্ম ও কর্ত্তা নিরন্তর পরস্পর সুসংবদ্ধ রহিয়াছে।

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
দেহে বিনষ্টে তৎ কর্ম্ম পুনর্দ্দেহে প্রলভ্যতে॥

কর্ম্ম দ্বারা জন্তু জন্মগ্রহণ করে এবং কর্ম্ম দ্বারা নষ্ট হয়। দেহ বিনষ্ট হইলে তৎকর্ম্মসমুদয় কর্ম্মানুরূপ অন্যদেহ-প্রাপ্তি করায়। এই জীবনে মনুষ্যোচিত ধর্ম্মের অনুশীলন করিলে মনুষ্য-জন্ম-লাভ করার সম্ভাবনা, নচেৎ যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিয়া সংস্কাররাশি সঞ্চিত করিবেন, তিনি

তদনুরূপ জাতি আয়ুঃ ও ভোগ প্রাপ্ত হইবেন।

সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।

পাতঞ্জলদর্শন সাধনপাদ ১৩ সূত্র।

অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চক্লেশ থাকিলেই ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মাশয়ের পরিণাম (বিপাক) জন্ম আয়ু ও ভোগ হইয়া থাকে। এই পঞ্চক্লেশ অবিদ্যা-মূলক। আমিত্ব বোধই অবিদ্যা। ক্লেশ-নিবৃত্তি হইলে কর্ম্মরাশি থাকিলেও জীব বদ্ধ হয় না। ভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে বারবার বলিয়াছেন যে, "তুমি আমিত্ব-বোধে যে সকল কর্ম্ম করিবে, তাহাই তোমার বন্ধের কারণ হইবে, অর্থাৎ সেই সকল সংস্কাররাশিই তোমাকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে লইয়া যাইবে।" অর্জ্জুন যখন বলিলেন যে, "আমি জ্ঞাতিবধরূপ পাপ কার্য্য করিয়া রাজ্য চাহি না," তখন ভগবান্ বলিলেন যে, "তুমি যদি আমার (ভগবানের) কর্ম্ম জানিয়া কর্ত্তব্যানুরোধে ধর্ম্মযুদ্ধ কর, তাহা হইলে তোমার কর্ম্মের জন্য তুমি দায়ী হইবে না; এরূপ কর্ম্মের দ্বারা জাত্যায়ুর্ভোগের উপযোগী কোন সংস্কার সঞ্চিত হইবে না। আর যদি তুমি 'অহং মম' জ্ঞান পরিহার করিতে না পার, অর্থাৎ কর্ম্মের কর্ত্তা তুমি—এই প্রকার জ্ঞানসহকারে কার্য্য কর, তাহা হইলে এই সকল কর্ম্মের শুভাশুভ ফলের জন্য তুমি দায়ী হইবে।" আমরা যদি এই আমিত্ব-জ্ঞান নষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের কর্ম্মজন্য সংস্কার সঞ্চিত হইবে না, এবং আমরা জন্মমৃত্যুর হাত এড়াইতে পারিব।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।

ভোগ ভিন্ন কর্ম্মক্ষয় হয় না।

না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প-কোটিশতৈরপি।

এক জন্ম কেন, কোটিকল্প কালেও কর্ম্মের ভোগ ভিন্ন ক্ষয় নাই। যিনি নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার প্রতি শাস্ত্রের

এই সকল শাসন-বাক্য প্রযোজ্য নহে; কারণ কর্ম্মের সংস্কার-রাশি যদি সঞ্চিত না হয়, তাহা হইলে আমাদিগের জন্মান্তর সংঘটিত হইতে পারে না।

শাস্ত্র বলিতেছেন—

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ।

মুণ্ডকোপনিষৎ।

যিনি যাদৃশ বিষয় উপভোগের নিমিত্ত কামবান্ হইয়া তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সেই বিষয়ের উপভোগের জন্য তত্তৎ স্থানে জন্মপরিগ্রহ করিয়া উহা ভোগ করেন; আর যিনি আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বিষয়ের উপর বীততৃষ্ণ হন, তাঁহার ইহজন্মেই সমস্ত কামনা বিলুপ্ত হইয়া যায়, আর বিষয়-ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্ম-পরিগ্রহ করিতে হয় না।

কর্ম্মে বাসনা বা আসক্তি না থাকিলে, সেই কর্ম্মের কোন বীজ অঙ্কুরিত হয় না—কাজেই ভর্জিত ধান্যের ন্যায় কর্ম্মের ফলোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। আমিত্বজ্ঞানই কামনামূলক এবং এই আমিত্ব আমাদিগের বিষয়ে আসক্তি জন্মাইয়া দেয়। যতদিন বিষয়ে আসক্তি থাকিবে, ততদিন বিষয়ের টানে আমাদিগকে বারংবার সংসারে আসিতে হইবে। জীবের এই আমিত্ববোধ অর্থাৎ অহংকারই মায়া, অবিদ্যা বা অজ্ঞান। শাস্ত্র এই অহং-জ্ঞানকে ভ্রমাত্মক বলিয়াছেন এবং নানা স্থানে নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই অহং ভাবই সমস্ত ক্লেশের মূল, ইহাই সর্ব্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। পরব্রহ্মের সহিত

জীবের যে ভেদবুদ্ধি অর্থাৎ জীবের অহং মদীয়ত্ব স্বাতন্ত্র্য জ্ঞান, তাহা তিরোহিত হইলে পরব্রহ্মের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয় ইহাই পরম মোক্ষ রূপ ব্রহ্মজ্ঞান। শাস্ত্রে ইহাকেই আত্ম-দর্শন বলিয়াছেন। এই ভেদ বুদ্ধি বিরহিত হইয়া চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্ত সম্যক্ নির্ম্মল হইলে আত্মসাক্ষাৎক্কার হইয়া থাকে। ইহাই পরম পুরুষকার সোঽহং জ্ঞান। শাস্ত্র, ইহাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। জীব সম্যক্ প্রকারে নিজ সত্তাকে তাঁহার সত্তায় যে পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দিতে না পারে সে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ জ্ঞান কখনও তিরোহিত হইতে পারে না এবং তাহার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মদর্শন কখনও হয় না।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও একদিন বলিয়াছিলেন "আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল" অর্থাৎ আমিত্ব জ্ঞান নষ্ট হইলেই জীবের কষ্টের শেষ হইবে। এই "আমি" মেঘ-স্বরূপ জ্ঞানসূর্য্যকে আবৃত করিয়া আছে। পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন—

"জীবের অহংকারই মায়া। যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্ত্তা' এই বোধ হ'য়ে গেল।' তা হ'লে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল।"

'জীব ও আত্মার (পরমাত্মার) প্রভেদ হয়েছে এই "আমি" মাঝখানে আছে ব'লে। জলের উপর যদি একটা লাঠি ফেলে দেওয়া যায়, তাহ'লে দুটা ভাগ দেখায়। বস্তুতঃ একজল, লাঠিটার দরুণ দুটা দেখাচ্ছে। 'অহং'ই ঐ লাঠি। লাঠি তুলে লও, সেই একজল থাক্‌বে।"

যদি এরূপ জ্ঞান জন্মে যে "এই সংসারে আমি কেহ নহি; আমি তাঁহার যন্ত্রস্বরূপ, তিনি আমাকে যেরূপে চালাইতেছেন আমি সেইরূপে চলিতেছি; এই ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র কিছুই আমার নহে, সমস্তই

তাঁহার ; তিনি আমাকে ঐগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়াছেন ; তাঁহার আজ্ঞাপালনই আমার ধর্ম ; তাহা হইলে সংসারে কোন জিনিষে আসক্তি থাকিতে পারে না।

রাজর্ষি জনক একদিন বলিয়াছিলেন "হে ঋষিগণ! আমি এই মাত্র অবগত আছি যে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং ইহার অন্তর্গত যাহা কিছু আছে সকলি ভগবানের অধিকারভুক্ত। এই অট্টালিকা, প্রাসাদশ্রেণী, দাস, দাসী, হস্তী, অশ্ব, নানাবিধ ঐশ্বর্য্য, শক্তি ও বৈভব প্রভৃতি যাহা এই স্থানে দেখিতেছেন এবং এই সকল ব্যতীত অন্য সমুদায়ও কোন প্রকারেই আমার নহে। আমি এই প্রকার চিন্তাস্রোতঃ অনুক্ষণ হৃদয়ে ধারণা করি এবং তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া আমি সকল কার্য্য সম্পন্ন করি। সমস্ত বস্তুই তাঁহার, এবং তাঁহারই শক্তিতে সকলই হয়। আমি যে কোন কার্য্য করি সে সমস্ত বস্তুতঃ তাঁহার কার্য্য, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমাকে সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। আমি তাঁহার ক্রীত-দাসের ন্যায় কেবল তাঁহারই আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি। আমার এই যে বিদ্যমানতা, ইহা তাঁহারই কার্য্যসাধনের জন্য এবং আমিও এই জ্ঞান সংযোগে সর্ব্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। 'সকলই ভগবানের' ইহা আমার যে মত-মাত্র তাহা নহে; আমি সত্য সত্যই জানি যে সকলই তাঁহার। ইহা আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করি ও যথার্থ বিদিত আছি। আর ইহাই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস।" এই ভাবের সাধনা চাই। যে মানবের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সাধনা বলে এই প্রকার জ্ঞান জন্মে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকিতে পারে না; ক্রমে আমিত্ব ভাব ক্ষীণ হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়।

যেদিন আমিত্ব ছুটিবে, সেদিন আসক্তিও যাইবে। অথবা অন্যভাবে

দেখিতে গেলে এইরূপ বলা যায়, ক্রমে আসক্তি কমিলে "আমত্ব"ও কমিয়া আসিবে। যতদিন আসক্তি, ততদিন "আমিত্ব"। একের নাশ হইলে অপরের নাশ হইবে। এখন জীবের এই আমিত্ব বা বিষয়ে আসক্তি কিরূপে নষ্ট করা যাইতে পারে তাহাই চিন্তনীয়। জীবের বিষয়াসক্তি নষ্ট করাই উপাসনার লক্ষ্য।

যদি জীব, নিজের সত্তাকে জগদীশ্বর সত্তায় ডুবাইয়া দিয়া কর্তৃত্বাভিমান সম্যক্ প্রকারে পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে জীবের বাসনারাশি তিরোহিত হইবে, এবং জীব, জন্ম মৃত্যুরূপ যাতনা ভোগ করিবে না। যে নিরবচ্ছিন্ন সুখের অন্বেষণে জীব ব্যাকুল হইয়া বিষয় রাশির মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে তাহা প্রাপ্ত হইবে। মানব সুখ ও শান্তির জন্য ছুটাছুটি করিতেছে—বিষয়-ভোগের দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাইবে মনে করিয়া ক্ষণে ক্ষণে নানা প্রকার বিষয় ভোগ করিতেছে কিন্তু পরক্ষণেই হতাশ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। যতদিন কর্তৃত্বাভিমান ও বিষয়ে আসক্তি, ততদিন বাসনারাশি দ্বারা তাড়িত হইয়া এইরূপ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবে এবং চিরস্থায়ী সুখ কিছুতেই প্রাপ্ত হইবে না।

বাসনার অর্থাৎ বিষয়-ভোগের ইচ্ছার নিবৃত্তি ভিন্ন জীবের উদ্ধারের অন্য কোন পন্থা নাই। এই বিষয়-বাসনা হইতেই জীব নানারূপ পাপ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে। বাসনা ভোগের দ্বারা নিবৃত্তি হয় না। শাস্ত্র বলিতেছেন—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

ভোগের দ্বারা কখনও কামনার নিবৃত্তি হয় না; অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন তাহার বৃদ্ধি হয় সেইরূপ বিষয়-ভোগ দ্বারাও ভোগবাসনা

ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে।

জীব, সংসারে বাসনা-রাশি দ্বারা তাড়িত হইয়া বিষয়ভোগ ভিন্ন এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না; কাজেই বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া কিরূপে বিষয়ের কঠোর বন্ধন এড়াইতে পারা যায় তজ্জন্য আমাদের ন্যায় বিষয়ী লোককে শাস্ত্র উপদেশ দিতেছেন—

বিষয়াকৃষ্টচিত্তস্য মহৌষধমুচ্যতে।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াপ্যবস্তূনাং ভগবত্যৈ সমর্পণম্॥

যাহার চিত্ত বিষয়ের দ্বারা আকৃষ্ট, তাহার জন্য মহৌষধ বলিতেছি—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য যে কোন দ্রব্য আছে সেই সমস্ত জগদম্বাকে সমর্পণ করিলে বিষয়ানুরাগ ক্রমে নিবৃত্ত হইবে। এ সংসারে যত প্রকার ভোগ্য বিষয় আছে, যদ্দ্বারা মানব সংসারে আবদ্ধ হয় সেই সমুদয় তাঁহাকে সমর্পণ করিলে বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হয়। ইহাই উপাসনা-যোগ বা কর্ম্মযোগ; ইহাতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম, তিনের মিশ্রণ আছে বলিয়া ইহাকে মিশ্রমার্গ বলা যাইতে পারে। বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তির পক্ষে এই প্রকার উপাসনাই প্রকৃষ্ট উপায়।

উপাসনার প্রথম স্তর—জগদম্বার সহিত একটি সম্বন্ধ স্থাপন করা। তাঁহার প্রতি অনুরাগ জন্মাইতে হইলে সম্বন্ধ স্থাপন করা আবশ্যক, এই জন্য শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন—"আদৌ সম্বন্ধস্থাপনম্।" ঈশ্বরে শাক্তের মাতৃভাব, শৈবের পিতৃভাব, বৈষ্ণবের অধিকার-ভেদে পতি পুত্র, সখা, প্রভু প্রভৃতি ভাব, সৌর ও গাণপত্যের প্রভুভাব প্রতিষ্ঠিত আছে। রুচি ও অধিকার-ভেদে যিনি যে সম্বন্ধ ধরিয়া যে ভাবে তাঁহাকে ভজনা করুন না কেন তাঁহার সেই ভাবই পরানুরক্তিরূপে পরিণত হইয়া ভগবৎ প্রাপ্তি করাইবে। মহামুনি শাণ্ডিল্য সর্ব্ব প্রথমে ভক্তি-লক্ষণ বলিয়াছেন "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"। নারদ ভক্তি-সূত্রে বলিয়াছেন "সা কস্মৈ পরম-

প্রেমরূপা"। সম্বন্ধ-স্থাপনই এই পরম অনুরক্তি বা পরম প্রেমলাভের প্রথম সোপান। পার্থিব সম্বন্ধের ভাবাশ্রয় ভিন্ন কোন প্রকার উপাসনাই সম্ভব নহে। সমস্ত প্রকার ভগবৎ-উপাসনাই কোন না কোন পার্থিব সম্বন্ধের সাদৃশ্যে সংস্থাপিত। সাধকগণ তাঁহাকে পিতা, মাতা, পতি, প্রভু, সখা ইত্যাদি ভাবে, কখনও পুরুষ কখনও স্ত্রীরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন। উপাসক মাত্রেরই এই প্রকার সম্বন্ধ সংস্থাপন অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে কোন প্রকার উপাসনা চলিতে পারে না। মানুষ পার্থিব সম্বন্ধের আশ্রয়ে উপাসনা করিলেও যখন উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করে, তখন সেই সকল সম্বন্ধের পরিবর্ত্তে এক অভেদ সম্বন্ধ "সোঽহং" তত্ত্ব সংস্থাপিত হয়। যিনি যে পথে যে সম্বন্ধ সম্বল নিয়া গমন করুন না কেন, সিদ্ধাবস্থায় সেই সর্ব্বোচ্চ ভাব 'সোঽহং তত্ত্বে' উপস্থিত হইবেন। তখন ভক্তিও জ্ঞানের পার্থক্য থাকে না; সমস্তই সোঽহং তত্ত্বে পরিণত হয়। এই জন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছেন---

"জ্ঞানাৎ সংজায়তেমুক্তি, ভক্তিঃ জ্ঞানস্য কারণম্"।

দেবীভাগবতে বলিয়াছেন—

ভক্তেস্তু যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতম্।

ভক্তির চরম অবস্থাই জ্ঞান। ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত। এই অবস্থায়—

ভক্ত মোর কণ্ঠহার ভক্ত মোর প্রাণ।
আমি তাতে সে আমাতে আমারি সমান॥

মাতৃভাবের সাধকগণ তাঁহাকে অকল্পিত মাতৃভাবে দেখিয়া থাকেন, ছেলের ন্যায় তাঁহার সহিত কতই আবদার, কতই অভিমান করেন।

"মা মা ব'লে আর ডাকিব না,
ওমা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা॥

অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহপি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥

(১২ অঃ ১০ শ্লোক)

যদি জ্ঞানের অভ্যাসে অসমর্থ হও, তবে আমার কর্ম্ম-পরায়ণ হও। সর্ব্বদা যে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান কর, তাহা আমার নিমিত্ত করিতেছ এইরূপ বদ্ধসংস্কার হইলে, জীব বিষয়ানুরাগ হইতে বিমুক্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন হইবে। (পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অনুবাদ)

প্রথমতঃ এই সংসার তাঁহার, সর্ব্বদা এই প্রকার চিন্তা করিয়া, সংসারের যাবতীয় কার্য্য "তাঁহার কার্য্য" বোধে করিতে হইবে। স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন সমস্তই তাঁহার, আমি কেবল তাঁহার চাকরী করিতেছি; তিনি আমার পিতা, মাতা, প্রভু, সখা বা পতি। (যিনি যে ভাবের সাধক সেই ভাব যোজনা করিয়া নিবেন।) আমি তাঁহার আদেশ ও নিয়োগ-মত কর্ম্ম করিতেছি। এই সংসারে যে কোন কার্য্য হইতেছে তৎসমস্তই তাঁহার সৃষ্টি-স্থিতি-পালন কার্য্যের অন্তর্গত, তিনি সমস্ত ক্রিয়ার অন্তরালে থাকিয়া তাহা সাধন করিতেছেন। তিনি যন্ত্রী আমরা যন্ত্র; যন্ত্রের যেমন যন্ত্রী ব্যতীত নিজের কর্ত্তৃত্ব নাই সেই প্রকার জীবেরও কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। জীব ভ্রান্ত হইয়া তাঁহার ক্রিয়া নিজের উপর আরোপ করিয়া নানাবিধ দুঃখ পাইয়া থাকে। এই সংস্কার বদ্ধমূল করিবার অভ্যাস করিতে হইবে।

প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে।

তোমার প্রিয়ার্থ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। তুমি এই সংসারের ভার দিয়াছ বলিয়া আমাকে এই সংসারের ভার বহন করিতে

হইতেছে। সংসারে যাহা কিছু করিতেছি, সমস্তই তোমার জন্ত করিতেছি।

প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎকরোমি জগন্মাত স্তদেব তব পূজনং॥

প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত, সন্ধ্যাকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যাহা করি, হে জগন্মাতঃ! তৎসমস্তই তোমার পূজা। গীতাতেও বারবার ভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি নিজের কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমার কার্য্য করিতেছে বলিয়া সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে সমস্ত দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। আর যে সমস্ত কার্য্যের নিয়ন্তা ও কর্ত্তা বলিয়া নিজকে বিশ্বাস করে, সে নিশ্চয়ই অধঃপতিত হইয়া বিনষ্ট হয়।"

"তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে আমি করি।"

যিনি এইভাবে কর্ম্ম করেন, তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না, তিনি কর্ম্মবন্ধন কাটাইয়া পরম শান্তিলাভ করেন। তখন তিনি সত্য সত্যই অনুভব করেন—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

(গীতা ১৮ অঃ ৬১ শ্লোক)

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকলের হৃদয়-দেশে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি মায়া দ্বারা প্রাণিগণকে যন্ত্রারূঢ় বস্তুর ন্যায় এই সংসার-রাজ্যে পরিভ্রমণ করাইতেছেন।

সাধকও এইভাবে বিভোর হইয়া গাহিয়াছিলেন—

যে বোল বলাও তুমি সেই বোল বলি আমি।
তুমি যন্ত্র তুমি মন্ত্র, তন্ত্রসারে সার তুমি॥

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও গৃহীদিগকে এই প্রকারে উপদেশ দিয়াছিলেন—

"সব কাজ কর্‌বে, কিন্তু ঈশ্বরে মন রাখ্‌বে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা সকলকে নিয়ে থাক্‌বে ও সেবা কর্‌বে; যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জান্‌বে, তারা তোমার কেউ নয়। বড় মানুষের বাড়ীর দাসী, সব কাজ কচ্ছে; কিন্তু দেশে নিজের বাড়ীর দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মত মানুষ করে। বলে "আমার রাম" "আমার হরি"; কিন্তু মনে মনে বেশ জানে—এরা আমার কেউ নয়।"

"সংসারের সব কর্ম্ম কর্‌বে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখ্‌বে।"

সংসারের সমস্ত কার্য্য তাঁহার, তিনি আমার দ্বারা সমস্ত কার্য্য করাইতেছেন। আমি তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠানের জন্য সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম করি। এই ভাবটী চিত্তে পোষণ করিয়া ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি তাঁহাকে অর্পণ করিতে হইবে, তাহা হইলে ক্রমে ইন্দ্রিয়ের টান কমিয়া আসিবে এবং সাধকের বিষয়ানুরাগ তাঁহার অনুরাগে পরিণত হইবে। এইজন্য গীতাতে উপদেশ দিয়াছেন—

মৎকর্ম্মপরমোভব। মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধি মবাপ্স্যসি।

আমার উদ্দেশে নানাবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান কর, তাহা হইলে ক্রমে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

মানুষ হস্ত, পদ, বাক্, উপস্থ ও পায়ু এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে গ্রহণ, গমন, বচন, মৈথুন ও মল-মূত্র-ত্যাগরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও চর্ম্ম এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন, আঘ্রাণ, রসাস্বাদ ও শীতোষ্ণাদি অনুভব করিয়া থাকে। এই দশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দশ প্রকার বিষয়ভোগ ভিন্ন জীবের আর

কোন আসক্তি নাই। জীবের সর্ব্বপ্রকার বাসনা ও আসক্তি ইহার কোন না কোনটার অন্তর্গত। ইহার অতিরিক্ত আর একটী ইন্দ্রিয় আছে, যাহাকে শাস্ত্র 'একাদশ ইন্দ্রিয় মন' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় মন হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে; একই শক্তি অবস্থাভেদে নানা নামে কথিত হয়। মনকে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় এতদুভয়ই বলা যাইতে পারে, কারণ এই দশটী ইন্দ্রিয় কেহই মন হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে। যেমন একই ব্যক্তি নানাবিধ অবস্থা ভেদে নানাপ্রকার নামে অভিহিত হয়, তেমন একই মন নানা ইন্দ্রিয়ের অবস্থায় পরিণত হইয়া নানা নামে কথিত হয়। এক্ষণ ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়-গুলি তাঁহাকে কি প্রকারে সমর্পণ করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্। মানুষের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্যই হস্ত-পদের ক্রিয়া হইয়া থাকে; কাজেই সেই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় ঈশ্বরাভিমুখ করিতে পারিলেই হস্ত পদের ক্রিয়াও তাঁহার উপাসনায় পরিণত হইবে; সুতরাং হস্ত-পদের বিষয় পৃথগ্ভাবে আলোচনা করার কোন আবশ্যকতা নাই। হস্ত-পদের ক্রিয়াতে কেহ বদ্ধ হয় না। এবং তাহাতে আসক্তিও হয় না। হস্ত পদ কেবল অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পরিচর্য্যা করে, কাজেই অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের আসক্তি কমিলে এই ইন্দ্রিয়দ্বয়ের আসক্তিও ক্ষীণ হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

(১) বাগিন্দ্রিয়ের বিষয় সমর্পণ।

মানুষ বাগিন্দ্রিয় দ্বারা নানাপ্রকার বাক্যালাপ করিয়া থাকে। সর্ব্বদা তাঁহার স্তব-স্তোত্র-পাঠ, গুণানুকীর্ত্তন, মন্ত্রজপ আদি করিলে বাগিন্দ্রিয়ের বিষয় তাঁহাকে সমর্পণ করা হয়। এইরূপ করিতে করিতে বাগিন্দ্রিয়ের অনুরাগ তাঁহার অনুরাগে পরিণত হয়। এইরূপ বাক্যালাপে সর্ব্বদা

তাঁহার ভাব বিমিশ্রিত থাকায় তাহা বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তির কারণ হয়। এই ভাবটী ক্রমে এরূপ অভ্যস্ত হয় যে সাধক, শাস্ত্রের আদেশ মত সর্ব্বদাই তাঁহার মন্ত্র ও গায়ত্রীজপে রত থাকেন।

অশুচির্বা শুচির্বাপি গচ্ছন্ তিষ্ঠন্ যথা তথা।
গায়ত্রীং প্রজপেৎ ধীমান্ জপাৎ পাপং নিকৃন্ততি॥

অশুচি কি শুচি, যে ভাবেই থাকুন, গমন কি উপবেশন করুন, ধীমান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা গায়ত্রী জপ করিবেন; কারণ জপের দ্বারা পাপ নিবৃত্ত হয়। তাঁহার নাম নিতে নিতে চিত্তের পাপ-বৃত্তিগুলি অপসারিত হইয়া সাত্ত্বিক ধর্ম্মভাবগুলি উদ্রিক্ত হয় এবং সাধক ক্রমে পবিত্রাত্মা হইয়া উত্তরোত্তর চিত্তের উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকেন। সংসারে থাকিতে হইলে নানাপ্রকার বাক্যালাপ করিতে হইবে সত্য, কিন্তু যে ব্যক্তি সংসারকে "তাঁহার সংসার" মনে করিয়া কার্য্য করেন, তাঁহার সংসার সম্বন্ধীয় কথাও তাঁহার উপাসনা ক্রিয়ার অন্তর্গত হয়, কারণ যাঁহার স্থির ধারণা যে "তাঁহার এই সংসারে আমি তাঁহারই নিয়োগ ও আদেশ মত কার্য্য করিতেছি"—সে ব্যক্তির সংসার সম্বন্ধীয় কথাও তাঁহারই অনুরাগমূলক; তাঁহার সংসারের কার্য্য-নির্ব্বাহ করার জন্য বাক্যালাপ করিতে হইতেছে, কাজেই এ সকল বাক্যালাপও তাঁহার প্রীতি ও অনুরাগমূলক। এই জন্য সাধক-প্রবর রামপ্রসাদ সেন গাহিয়াছিলেন "যত শোন কর্ণপুটে সকলি মায়ের মন্ত্র বটে।" বাগিন্দ্রিয়কে ঈশ্বরাভিমুখ করিয়া চিত্তের রজস্তমো-রূপ কালিমা দূর করার জন্য শাস্ত্রে নানাপ্রকার মন্ত্রাদি জপের ব্যবস্থা আছে। ঐ সকল মন্ত্র-জপ অর্থাৎ বার বার উচ্চারণ করিলে চিত্ত ঈশ্বরাভিমুখ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাগ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া, বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়। শাস্ত্র বলেন—

মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

মনন অর্থাৎ চিন্তা দ্বারা মন্ত্র ত্রাণ করেন বলিয়া 'মন্ত্র' বলা হয়।

মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসার-বন্ধনাৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামামন্ত্রান্মন্ত্র উচ্যতে॥

যাহার মনন হইতে বিশ্ব বিজ্ঞান হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তা হইতে ব্রহ্মাণ্ড-সত্তা যে পৃথক্ নহে—এই জ্ঞানের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয় এবং সংসার বন্ধন হইতে পরিত্রাণ হয় ও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়, তাহাকে মন্ত্র বলে।

মন্ত্র-জপের দ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্রোক্তমতে বার বার আবৃত্তি দ্বারা ক্রমে জীবের চিত্তের কালিমা অপসারিত হয়। জীব সংসারের মায়াময় বন্ধন কাটাইয়া সোঽহং জ্ঞান লাভ করে। এই জন্য শাস্ত্র বারবার বলিয়াছেন—

জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।

মন্ত্র সিদ্ধিবলে সাধকের ত্রিলোক-দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়, তখন অলৌকিক বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না। শ্রীকৃষ্ণাবতারে ভগবান্‌ও গীতায় ১০ম অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে বলিয়াছেন—

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি।

যত প্রকার যজ্ঞ আছে তন্মধ্যে ভগবানের নাম (মন্ত্র) জপই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। এই শ্লোকে ওঁকার জপের কথা বলিয়াছেন; কারণ শ্লোকের পূর্ব্ব চরণে আছে।

গিরামস্ম্যেকমক্ষরং।

বাক্যের মধ্যে আমি ওঙ্কার। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ যাগাদি করুন আর না করুন, একমাত্র জপ দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জপ কাহাকে বলে, তাহা পাতঞ্জল-দর্শনে সমাধি পাদ ২৭ ও ২৮ সূত্রে বলিয়াছেন। ২৭ সূত্রে আছে—

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।

প্রণবের (ওঙ্কারের) বাচ্য ঈশ্বর। প্রণব বাচক, ঈশ্বর বাচ্য। প্রকাশ করা ধর্ম্ম যেমন স্বভাবতঃই প্রদীপের আছে, তদ্রূপ মন্ত্রজপ দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই বাচ্য ও বাচক সম্বন্ধ নিত্য।

২৮ সূত্রে আছে—

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।

প্রণবের জপ, প্রণবের অভিধেয়ের অর্থাৎ ঈশ্বরের ভাবনা। প্রণবের জপ ও প্রণবার্থ অর্থাৎ পরমেশ্বরের রূপ ধ্যান দ্বারা যোগী চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিয়া থাকেন। উক্ত জপ ও ভাবনা-রূপ সাধন হইতে জীবের স্বরূপ-দর্শন হয় এবং মুক্তির বিঘ্নকর অন্তরায়—যদ্দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ অর্থাৎ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়,—তাহাও দূরীভূত হয়। এ স্থানে কেবল ওঙ্কার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য বীজ-মন্ত্র ও নাম জপের দ্বারা এইরূপ ফল হইয়া থাকে। মন্ত্র জপ করিতে করিতে সাধক ব্রহ্মসত্তায় ডুবিয়া যান।

ভক্ত হরিদাস নামমাহাত্ম্য এরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

কেহ বলে নাম হইতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে নাম হইতে জীবের মোক্ষ হয়॥
হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণ পদে প্রেম উপজয়।
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥ শ্রীনরোত্তম।
নাম ও নামী যে অভিন্ন বস্তু তাহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত।

প্রত্যেক শব্দের যে বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি আছে তাহা আর্য্যঋষিগণ বহুপূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

মন্ত্রোচ্চারণমাত্রেণ দেব-রূপং প্রজায়তে।

মন্ত্র উচ্চারণ মাত্র তৎপ্রতিপাদ্য দেবতার রূপের আবির্ভাব হয়। এই জন্য মন্ত্রশক্তিকে অক্ষর ভাবনা করিতে নিষেধ করিয়া নরক ব্যবস্থা করিয়াছেন।

গুরৌ মানুষবুদ্ধিঞ্চ মন্ত্রে চাক্ষর-ভাবনাং।
প্রতিমায়াং শিলাবোধং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ॥

গুরুদেবে যাহার মনুষ্য-বুদ্ধি, মন্ত্রে যাহার অক্ষরভাবনা এবং দেব-প্রতিমায় যাহার শিলাবুদ্ধি, সে ব্যক্তি নরকে গমন করে।

শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী তাঁহার "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কতক অংশ উদ্ধৃত করা হইল—

"বিশেষ বিশেষ শব্দের সহিত বিশেষ বিশেষ রূপের (মূর্ত্তির) যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, তাহা এক্ষণকার বিজ্ঞান-বলেও প্রমাণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রত্যেক শব্দেরই স্বীয় অনুরূপ মূর্ত্তি আছে। যাঁহারা আধুনিক শব্দ-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে, শব্দ বায়ুকে তরঙ্গায়িত করিয়া, কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়; সেই সকল তরঙ্গের রূপ শব্দের পরিবর্ত্তন অনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়. এই সকল রূপকে অবলম্ব করিয়া পুনরায় তদনুরূপ শব্দ উৎপাদন করা যায়। রূপ ও শব্দের সম্বন্ধ-জ্ঞান হইতে আধুনিক ফনোগ্রাফ্ যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। শব্দ-বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা পাশ্চাত্য প্রদেশেও সম্প্রতি ইহা প্রকাশিত হইয়াছে যে, সঙ্গীত সকলের নানাবিধ মূর্ত্তিভেদ আছে, ইডোফোন নামক যন্ত্র-সাহায্যে মার্গেরেট হিউজেস ইয়োরোপীয় সঙ্গীত স্বরলিপির মূর্ত্তি সকল সম্প্রতি প্রকাশিত করিয়াছেন।

যে শব্দের যে মূর্ত্তি স্বভাবতঃ প্রকাশ পায়, তাহার সহিত সেই শব্দের সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যদি কোন ভাষায় শব্দ সকল

এইরূপে গঠিত হয় যে, সেই সকল শব্দে পূর্ব্বোক্তরূপ স্বাভাবিক যে মূর্ত্তি আছে, সেই মূর্ত্তিবিশিষ্ট পদার্থই সেই সকল শব্দের বাচ্য হয়, তবে সেই ভাষা প্রকৃত প্রস্তাবে সিদ্ধ ভাষা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সংস্কৃত ভাষা এইরূপ সিদ্ধ-ভাষা, এই নিমিত্ত ইহাকে দেবভাষা বলে।"

অতীন্দ্রিয় দ্রষ্টা ঋষিগণ এই সকল রহস্য জানিতেন বলিয়া প্রত্যেক দেবতার পৃথক্ পৃথক্ বীজ-মন্ত্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, যে বীজমন্ত্র জপ করিলে যে রূপের আবির্ভাব হয়, তাহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—

দেবতায়াঃ শরীরাণি বীজাদুৎপদ্যতে ধ্রুবং।
শৃণুদেবি প্রবক্ষ্যামি বীজানাং দেব-রূপতাম্ ॥

দেবতার শরীর বীজমন্ত্র হইতে উৎপন্ন হয়, হে দেবি! বীজমন্ত্র যে দেবতার স্বরূপ, তাহা তুমি শ্রবণ কর।

এই জন্য বীজমন্ত্রাদির ভাষা হওয়া অসম্ভব। মন্ত্রের ভাষান্তর কি মন্ত্রের শব্দ বিন্যাসের বিপর্য্যয় করিলে মন্ত্রশক্তি নষ্ট হইয়া যায়; যে উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহা সিদ্ধ হয় না।

শ্রীমতী এনিবেসাণ্ট মন্ত্রের শক্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"To translate a mantra is to change it from a word of power into an ordinary sentence; the sounds being changed, other sound forms are created."

কোন মন্ত্র অনুবাদ করিলে মন্ত্রশক্তি নষ্ট হইয়া সাধারণ কথাতে পরিণত হয়। শব্দ পরিবর্ত্তিত হইলে শব্দানুযায়ী অন্যপ্রকার রূপ সৃষ্ট হইবে।

মন্ত্রের যে অদ্ভুত শক্তি আছে, তাহা সাধকগণ প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। মন্ত্রশক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে সাধকের আত্মশক্তি

তীব্রবেগে বর্দ্ধিত হইতে থাকে; অবশেষে মন্ত্রশক্তির প্রভাবে সাধক চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়। ইহা কবির কল্পনা কি বাতুলের প্রলাপ বাক্য নহে; দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে মন্ত্র জপ করিলে, যে কেহ, এ রহস্য নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। তখন আর কোন প্রকার যুক্তি-তর্কের আবশ্যক হইবে না। মন্ত্রশক্তি নিজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং চরমে মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় নিজের জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশিত হইবে। মন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষগণ নিজ নিজ জীবনে মন্ত্র-শক্তির অলৌকিক প্রভাব দেখাইয়া গিয়াছেন। সে দিনও দক্ষিণেশ্বরের নিরক্ষর রামকৃষ্ণদেব, কালী-মন্ত্রের সাধনা দ্বারা মন্ত্রশক্তির আশ্চর্য্য প্রভাব দেখাইয়াছেন। পাশ্চত্য-সভ্যতালোক-দীপ্ত ব্যক্তিগণও তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেন। তাঁহার উপদেশ বাক্যগুলি আপ্তবাক্যের ন্যায় বঙ্গবাসী পাঠ করিয়া শাস্ত্রের রহস্য সকল অবগত হইতেছেন।

মন্ত্র ভাষান্তর করিলে মন্ত্রের শক্তি নষ্ট হয় সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া যে মন্ত্রগুলি বুঝিতে হইবে না, এরূপ শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে।

মন্ত্রার্থং মন্ত্র-চৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ।
শত-লক্ষ-প্রজপ্তোঽপি তস্য মন্ত্রো ন সিধ্যতি।

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

যে সাধক, মন্ত্রের অর্থ কিম্বা মন্ত্রের শক্তি জানেন না, তিনি শত লক্ষ বার জপ করিলেও তাহার মন্ত্র সিদ্ধ হইবে না। মন্ত্রের অর্থ জানিয়া জপ করিলে তাহার ফল শীঘ্র হইবে। না বুঝিয়া না জানিয়া অনুষ্ঠান করিলে ফলের হ্রাস হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে মন্ত্রের শক্তি-প্রভাবে আংশিক ফললাভ ঘটিবে। আর্য্যশাস্ত্রের উপদেশ এই, "দেবতার নাম সমন্বিত মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ রটনা, স্মরণ ও মন্ত্রার্থের ধ্যান

দ্বারা সাধকের চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং দেবতা সকল আকৃষ্ট হইয়া সাধকের নিকট উপস্থিত হইয়া অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন।"

পরমার্থ সঙ্গীত বাগিন্দ্রিয় সমর্পণের আর একটী প্রকৃষ্ট উপায়। সঙ্গীত দ্বারা চিত্তে পরম ভক্তি ভাবের উদয় হয়, ইহা সকলের প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য। শাস্ত্রও এইজন্য "গানাৎ পরোতরো নহি" বলিয়া গীতকে সাধনের একটী অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাদের নিজ নিজ জীবনে সঙ্গীতের মাহাত্ম্য দেখাইয়া গিয়াছেন। আজিও সাধক সম্প্রদায় তাঁহাদের রচিত সঙ্গীত দ্বারা নিজ নিজ চিত্তকে বিষয় হইতে প্রত্যাকৃষ্ট করিয়া ঈশ্বরাভিমুখ করিতে সমর্থ হইতেছেন।

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাম্ হৃদয়ে নচ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

ইহা নারদের প্রতি ভগবদ্ বাক্য।

(২) উপস্থ ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমর্পণ।

উপস্থ ইন্দ্রিয়ের অবিহিত পরিচালনায় জীব নানা দুঃখ লাভ করিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। সংসারের অর্দ্ধেক রোগ, শোক, অকালমৃত্যু ও নানাবিধ কুক্রিয়া, এই ইন্দ্রিয়ের আসক্তি দ্বারা সংঘটিত হয়। এই দুরন্ত রিপুকে বশীভূত করিতে পারিলে মানবের বিষয়-বাসনা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেব "কামিনী কাঞ্চন" সাধন পথের বিষম অন্তরায় বলিয়া বার বার উপদেশ দিয়াছেন। পুরাণ ইতিহাস পাঠে জানা যায়—কত যোগী ঋষি উপস্থ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় অধঃপতিত হইয়াছেন। এই প্রবল রিপুকে সংযত করিবার জন্য শাস্ত্র, নানারূপ বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ

করিয়াছেন। যিনি যত বিধি-নিষেধ পালন করিবেন, তাঁহার ইন্দ্রিয় তত সংযত হইবে। ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তু চাহিতেছে, সাধক নিষেধ-বাক্য মানিয়া ইন্দ্রিয়কে সংযত করিতেছেন, এই প্রকার করিতে করিতে ইন্দ্রিয়, সাধকের অধীন হইয়া পড়িবে; তখন আর সাধক ইন্দ্রিয়ের অধীন হইবেন না। ক্রমে অন্তরিন্দ্রিয় সংযত হইলে আসক্তিও ক্ষীণ হইয়া আসিবে এবং সাধক ইন্দ্রিয়জয়ী বীর হইবেন। তন্ত্র-শাস্ত্রও এইরূপ বীরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "বীরশ্চোদ্ধতমানসঃ"। যাঁহারা ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন, তাঁহারাই উদ্ধতমানসসম্পন্ন বীর। স্থানান্তরেও বলিয়াছেন "সিদ্ধমন্ত্রী ভবেদ্ বীরো ন বীরো মদ্যপানতঃ"। মদ্যপান করিলেই বীর হয় না, যাঁহারা আসক্তি পরিহার পূর্ব্বক মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত বীর।

ইন্দ্রিয়কে সংযত করিতে হইবে সত্য কিন্তু ইন্দ্রিয়ের একেবারে উচ্ছেদ বা ধ্বংস করিতে হইবে না। স্থান বিশেষে সন্ন্যাসীদিগকে এই ইন্দ্রিয়ের বহির্যন্ত্রকে বিকল করিতে দেখা যায়, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন ফললাভ হয় বলিয়া বোধ হয় না। শাস্ত্রের ইহা মর্ম্ম নহে যে, ইন্দ্রিয়কে বাহিরে সংযত করিয়া আসক্তি-প্রযুক্ত মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি স্মরণ করিলে কোন দোষ হইবে না; কারণ এরূপ ব্যক্তিকে গীতায় মিথ্যাচার বা কপটাচার বলিয়াছেন—

> কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্
> ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।
>
> গীতা ৩ অঃ ৬ শ্লোক।

যে ব্যক্তি হস্ত, পদ, শিশ্নাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল বাহিরে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি স্মরণ করিতে থাকে, সেই বিমূঢ়াত্মা ব্যক্তিকে মিথ্যাচার বা কপটাচার বলা যায়। কেবল

৩

বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম করিলে চলিবে না, অন্তরিন্দ্রিয়েরও সংযম আবশ্যক অর্থাৎ আসক্তি-শূন্য হওয়া চাই।

বনেহপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণো
গৃহেহপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।

আসক্তি ছাড়িতে না পারিলে বনে গেলেও আসক্তিযুক্ত পুরুষ দোষ মুক্ত হয় না, গৃহে থাকিয়া আসক্তি-শূন্য হইয়া ইন্দ্রিয় সংযত করিতে পারিলে তাহাও তপস্যা বলিয়া পরিগণিত হয়।

কবিও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।

বিকার সামগ্রী সমুদায় উপস্থিত সত্ত্বেও যাহাদের চিত্ত বিকৃত অর্থাৎ বিচলিত না হয় তাহারাই ধীর। অবশ্য এই অবস্থা একদিনে হইবার সম্ভাবনা নাই; ইহাতে বহু চেষ্টা ও সাধনা আবশ্যক।

ঈশ্বর একাকীই স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব শক্তিরূপে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। এই দুই শক্তির পরস্পর সংযোগ ব্যতীত তাঁহার সৃষ্টিক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না। পিতৃ-মাতৃ শক্তির সনাতন লীলা দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিত্যাদি যাবৎ কার্য্য সংসাধিত হইতেছে। স্ত্রী পুরুষের সম্মিলন না হইলে সন্তানোৎপত্তি হইতে পারে না; ইহা তাঁহার সৃষ্টি-প্রক্রিয়া। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও উদ্ভিজ্জাদি যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে একই নিয়মে ক্রিয়া হইয়া থাকে। এই সৃষ্টিতত্ত্ব সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া, যে ব্যক্তি শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট কালে ভার্য্যাতে উপগত হন, তিনি স্ত্রীকে ভোগ্য ভাবে না দেখিয়া অতি পবিত্র ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। এই তত্ত্ব সর্ব্বদা অনুধ্যান করিয়া, যিনি সৃষ্টি-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করেন, তিনি কখনও উপস্থ ইন্দ্রিয়ের দাস হইতে পারেন না। তাঁহার উপস্থ ইন্দ্রিয়ের অনুরাগ বিষয়ানুরাগ নহে, উহা ঈশ্বরের অনুরাগ-মূলক।

সন্তান উৎপাদনের জন্য যিনি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কঠোর নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক ভার্য্যাতে উপগত হন, শাস্ত্র তাঁহাকে ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন—

অপত্যোৎপাদনার্থঞ্চ তীব্রং নিয়মমাস্থিতঃ।
কালে নিয়মিতাহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

সন্তান উৎপাদনের জন্য যিনি তীব্র নিয়ম অবলম্বন করেন ও যথা-কালে নিয়মিত আহার করেন তিনি জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী। আমরা এই সকল শাসন-বাক্য অবহেলা করিয়া রোগ-শোকে আধি-ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। নিজ নিজ জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহার যথার্থতা বুঝিতে পারা যায়।

ভগবান্ গীতার দশম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশতি শ্লোকে বলিয়াছেন "প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ"—মৈথুনাভিলাষে যত প্রকার কাম চেষ্টা আছে, তন্মধ্যে পুত্রোৎপাদন করিবার জন্য কন্দর্পবৃত্তিই তাঁহার বিভূতি। "প্রজনশ্চ" পদের 'চ'কার দ্বারা পুত্রকামনা ব্যতীত বৃথা মৈথুনের নিষেধ করিয়াছেন। ভগবানের এই বিভূতি ইতর জীব জগতে আপেক্ষিক শুদ্ধ ভাবে বিরাজ করিতেছে। মনুষ্যের মধ্যে এই পবিত্র কাম-প্রবৃত্তি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া সম্ভোগ মাত্রে পরিণত হইয়াছে। এই পবিত্র কামের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ঋষিগণ নানা প্রকার বিধি-নিষেধ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখন আমরা তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত তিথি নক্ষত্রের বিচারকে হাসিয়া উড়াইয়া দেই; কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা, দাম্পত্য-সম্বন্ধে যথেচ্ছ ইন্দ্রিয় সেবার লালসা রোধ করার কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছেন না। এই পবিত্র কাম, সৃষ্টির আদি, তাই শাস্ত্র ইহাকে আদিরস বলিয়াছেন। প্রজা-সৃষ্টি ব্যাপারে ইহা ভগবানের চিদানন্দ-বিভূতি।

গীতায় সপ্তম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকেও এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

ধর্ম্মাবিরুদ্ধোভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ।

শ্রীধরস্বামী তাঁহার টীকায় এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"ধর্ম্মেণাবিরুদ্ধঃ স্বদারেষু পুত্রোৎপাদন-মাত্রোপযোগী কামোঽহমিতি"।

ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত যে কামবৃত্তি, নিজ-ধর্ম্মপত্নীতে মাত্র উপগত করায়, তাহা তাঁহারই (ভগবানেরই) স্বরূপ।

প্রাচীন ভারতে আর্য্যগণ, প্রজোৎপত্তির জন্য গৃহী হইতেন—"প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাং"; তাঁহারা অসংযত কামোপভোগের জন্য দারপরিগ্রহ করিতেন না; তাঁহারা কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা পুরুষত্বকে পরিপুষ্ট করিয়া, বলিষ্ঠ দেহে ও নির্ম্মল মনে বহু বিধি-নিষেধের দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া, সন্তান উৎপাদন করিতেন। শাস্ত্রের শাসন-প্রভাবে অযথা প্রজোৎপত্তি নিবারিত হইত এবং বর্ত্তমান পাশ্চাত্য-নীতির অনুসরণ করিয়া অযথা প্রজাবৃদ্ধি নিবারণ করা আবশ্যক হইত না; কিন্তু ভারতের সে শিক্ষা-দীক্ষা এক্ষণ অতীতের কাহিনী। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—সন্তানের জন্য ভার্য্যার প্রয়োজন, শাস্ত্রের এই বহুমূল্য উপদেশ শুনিয়া নব্যসমাজ, প্রাচীন-সমাজের এই আদর্শকে অতি হীন বলিয়া উপেক্ষা করেন; কিন্তু তাঁহারা কি ভাবে এই কথা বলিয়াছেন, তাহা একবারও চিন্তা করিয়া দেখেন না! তাঁহারা অযথা কামোপভোগের জন্য দারপরিগ্রহ করা আত্মার অকল্যাণকর মনে করিতেন।

ভগবান্ "প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ" বাক্যে সন্তান-কামনায় যে শুদ্ধ পবিত্র কামের উল্লেখ করিয়াছেন "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" দ্বারাও ঐ কথাই বলিয়াছেন। তাঁহারা বৃথা পাশব-কামবৃত্তি সেবার জন্য দার-পরিগ্রহ করিতেন না; পুত্রোৎপাদনরূপ ধর্ম্মের জন্য ভার্য্যা গ্রহণ করিতেন। আর্য্যেরা ইহাও জানিতেন, স্ত্রী, পুরুষের ধর্ম্ম-সাধনার প্রধান সহায়। এই কারণে স্ত্রীর অপর নাম সহধর্ম্মিণী। স্ত্রী, ভোগ-বিলাসের সামগ্রী নহে।

শাস্ত্রে অনেক ধর্ম্ম কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে, যাহা পুরুষ স্ত্রীর সহিত মিলিত না হইলে সম্পন্ন করিতে পারে না।

শ্রুতিতে (যজুর্ব্বেদে) বলিয়াছেন—

অর্দ্ধোহবা তাবদ্ভবতি যাবন্নজায়াম্বিন্দতি।
অথ জায়াম্ বিন্দতি পূর্ণোবাব তদা ভবতি ॥

পাণিগ্রহণ না করা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ একটী আত্মা হয় না, আধখানা আত্মা থাকে ; পরে জায়া-লাভ করিলে একটী পূর্ণ আত্মা হয়। মনুষ্যের স্ত্রী পুরুষের আন্তরিক সম্মিলনের দ্বারা উভয়ের আধ্যাত্মিক শক্তিগুলি পরিপুষ্ট লাভ করে এবং একটী পূর্ণ আত্মা হয়।

এজন্য হিন্দুবিধবার পত্যন্তর গ্রহণ হইতে পারে না। আত্মার এরূপ সম্মিলন ও একীকরণ, হিন্দুজাতি ভিন্ন অন্যত্র নাই। উপস্থ ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে বিরত করিয়া ঈশ্বরাভিমুখ করার আর একটী সুগম উপায় অন্য স্ত্রীকে মাতৃজ্ঞান করা। "মাতৃবৎ পরদারেষু" পরস্ত্রী মাত্রই মাতৃজ্ঞান করিবে এবং মাতৃজ্ঞানে স্ত্রী-জাতিকে পূজা (সম্মান) করিবে। মাতৃসাধক অন্য নারীদেহে তাঁহার মাতৃরূপ দেখিয়া থাকেন।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"।

(চণ্ডী)

তিনি সর্ব্বভূতে মাতৃভাবে বিরাজ করিতেছেন। এজন্য মনুষ্য, পশু, কীট, পুষ্প, বৃক্ষ সমস্ত স্থানে মাতৃশক্তির বিকাশ দেখিতে পান ; "কুমারী-রূপধারিণী" বলিয়া সরলপ্রাণা বালিকাতে ঈর্ষা অসূয়া প্রভৃতি স্বার্থপরতার আবর্জ্জনা শূন্য দেখিয়া, নিজের উপাস্য মাতৃশক্তির আরাধনা করিয়া থাকেন।

প্রাচীনগণের "গুরু নিতম্ব পীন-পয়োধর" প্রভৃতি বর্ণনায় আমরা কুরুচি আরোপ করি কিন্তু তাঁহারা স্ত্রী-জাতিকে কি ভাবে দেখিতেন, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"—জগতে কেবল মানুষ কেন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও উদ্ভিদ্ প্রভৃতি প্রাণীসমূহে সমস্ত স্ত্রী-জাতিতে তাঁহারা জগদম্বার মাতৃশক্তির খেলা দেখিতেন। সন্তান যেমন মাতৃস্তন ও অন্যান্য অঙ্গ অতি পবিত্র ও ভক্তির দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে, মাতৃমূর্ত্তির বর্ণনাকালে তাঁহারা অতি সহজ ও পবিত্র ভাবে প্রণোদিত হইয়া ঐরূপ চিত্র অঙ্কিত করিতেন। ইহা কুরুচির পরিচায়ক নহে। উপাস্য দেবতার বর্ণনাকালেও "পীনোন্নত-পয়োধরাং" বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আমাদের এক্ষণ ভাবের ঘরে চুরি হইয়াছে। আমরা তাঁহাদের পবিত্র দৃষ্টি ও পবিত্র ভাব হারাইয়া, সুরুচি কুরুচি নিয়া বিষম বিভ্রাটে পতিত হইয়াছি।

যে সাধক এই প্রকার পবিত্র ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সৃষ্টি-রহস্য স্মরণ রাখিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কালে স্বীয় ধর্ম্মপত্নীতে উপগত হন এবং স্ত্রীকে ভোগ-বিলাসের সামগ্রীরূপে না দেখিয়া, অতি পবিত্রভাবে দর্শন করিয়া থাকেন ও সমস্ত নারী-জগতে মাতৃশক্তির বিকাশ দেখিয়া থাকেন, তাঁহার উপস্থ ইন্দ্রিয়ের প্রতি আসক্তি জন্মিতে পারে না। তাঁহার স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ—বিষয়ানুরাগ নহে, ঈশ্বর-অনুরাগ মূলক এবং তিনি তদ্দ্বারা আবদ্ধ হন না। যে অনুরাগ ভোগ কামনা দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাই জীবকে আবদ্ধ ও অধোগত করে কিন্তু ভগবানের নিয়ম ও আজ্ঞা পরিপালনের জন্য কোনরূপ বিষয়ভোগে লিপ্ত হইলেও জীব তদ্দ্বারা আবদ্ধ হয় না। এইরূপ ব্যক্তি সর্ব্বদা সৃষ্টিরহস্য অনুধ্যান করিয়া ভগবানের ভাবে বিভোর হন এবং তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। তাঁহার এই প্রকার অনুরাগ ঈশ্বর-উপাসনার অন্তর্গত।

(৩) পায়ু ইন্দ্রিয়।

পায়ু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা মলত্যাগ করিয়া থাকি। এই ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে কাহারও কোন অনুরাগ কি আসক্তি জন্মিতে পারে না; কাজেই এই ইন্দ্রিয় সমর্পণ করার কোন প্রয়োজন নাই।

আমাদেরপাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা পাঁচ প্রকার কার্য্য করিয়া থাকি, তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে এক্ষণ এই সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সমর্পণ বিষয় চিন্তা করা যাউক্।

(১) চক্ষুরিন্দ্রিয়

আমরা চক্ষু দ্বারা নানা প্রকার সুদৃশ্য বস্তু দেখিয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া থাকি। নয়নেন্দ্রিয়ের বৃত্তি, বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া ঈশ্বরাভিমুখী করিতে হইলে সর্ব্বদা তাঁহার মূর্ত্তিদর্শন এবং আলেখ্যাদি সম্মুখে রাখিয়া বার বার দৃষ্টি করা আবশ্যক। তাঁহার মূর্ত্তি শুদ্ধ সত্ত্ব-গুণ সম্পন্ন, ঐ সকল মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়া তদনুরূপমূর্ত্তি মানস-পটে ধ্যানযোগে চিন্তা করিলে, মানুষের বিষয়ে আসক্তি ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে এবং পরিশেষে সাধক তন্ময়ত্ব লাভ করেন।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ভাবিতং তীব্রবেগেন যদ্বস্তু নিশ্চয়াত্মনা।
পুমান্ তদ্ধি ভবেচ্ছীঘ্রং জ্ঞেয়ং ভ্রমর-কীটবৎ॥

পুরুষ দৃঢ় সংকল্প হইয়া তীব্রবেগের সহিত যে বস্তু ভাবনা করে, সে শীঘ্রই তাহা হয়, যেমন তেলাপোকা কাঁচ পোকাতে পরিণত হয়।

শাস্ত্রে আট প্রকার মূর্ত্তির উল্লেখ আছে—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যাচ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্ট বিধা স্মৃতা॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

১ শৈলী (শিলাময়ী)। ২ দারুময়ী অর্থাৎ কাষ্ঠনির্ম্মিতা। ৩ লৌহী—(লৌহা-নির্ম্মিতা)। ৪ লেপ্যা অর্থাৎ চন্দনাদি লেপন দ্বারা নির্ম্মিতা। ৫ লেখ্যা চিত্রিতা। ৬ সৈকতী—বালুকা-নির্ম্মিতা মৃণ্ময়াদি প্রতিমাও ইহার অন্তর্গত। ৭ মনোময়ী অর্থাৎ মনে মনে চিন্তা দ্বারা চিত্রিত মুর্ত্তি। ৮ মণিময়ী—বহুমূল্য মণি প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিতা।

এই সকল প্রতিমা যথাশাস্ত্র দেবতার অনুরূপ হওয়া আবশ্যক।

আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বস্য পূজায়াশ্চ বিশেষতঃ।
সাধকস্য চ বিশ্বাসাৎ সান্নিধ্যা দেবতা ভবেৎ ॥

কুলার্ণব-তন্ত্র।

প্রতিমা যদি যথাশাস্ত্র দেবতার অনুরূপ হয় পূজার উপচারাদিরও যদি বিশেষ অনুষ্ঠান থাকে, আর সাধকের যদি বিশ্বাস থাকে, তবে প্রতিমাদিতে দেবতা সন্নিহিত হয়েন।

নানা প্রকার বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প মাল্যাদি দ্বারা ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি সাজাইয়া তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য-সন্দর্শনে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বৃত্তি তাঁহার প্রতি অর্পণ করিতে হইবে। তাঁহার জন্য বিচিত্র মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া, তাঁহার সাজসজ্জা করার জন্য এবং তাঁহার আঘ্রাণের নিমিত্তে পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করিতে হইবে। আত্মতৃপ্তির জন্য ও বিলাসিতার জন্য পুষ্পোদ্যান না করিয়া তাঁহার সেবা ও পরিচর্য্যার জন্য করিতে হইবে। যাহা নিজের ভোগ বিলাসের জন্য করা যায়, তাহাতেই মানুষের আসক্তি জন্মে এবং আসক্তি জন্মিলেই আসক্তি-জনিত সংস্কারের বীজ সঞ্চিত হইতে থাকে, আর তাঁহার প্রতি আসক্তি ও অনুরাগের জন্য, তাঁহার পূজার জন্য, তাঁহার সাজ সজ্জার জন্য যে সকল কর্ম্ম করা যায়, তাহা বন্ধনের কারণ না হইয়া মোক্ষের কারণ হইবে; কারণ তাঁহার প্রতি অনুরাগ সত্ত্বগুণমূলক। চিত্তে যত সাত্ত্বিক ভাব সঞ্চিত হইবে, ততই চিত্তের কালিমা অপসারিত

হইবে, চিত্ত স্বচ্ছ কাচের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। যদি কোন ব্যক্তি নিজের ভোগের জন্য না করিয়া তাঁহার সেবার জন্য উদ্যানাদি করে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ক্রমে তাঁহার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তিলাভ হইবে। তাঁহার অনুরক্তিমূলক কার্য্য বিষয়-কার্য্য হইলেও তদ্দ্বারা জীব অধোগতি লাভ করে না। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের এই প্রকার তৃপ্তি তাঁহার প্রতি অনুরাগের দ্বারা জড়িত থাকায়, দর্শনের অনুরাগ সম্পূর্ণভাবে তাঁহার অনুরাগে পর্য্যবসিত হইবে। অবশ্য বস্ত্র ভূষণ প্রভৃতি নয়নের তৃপ্তিকর বিষয় যাহা কিছু তাঁহাকে নিবেদন করিবে, তাহা নিজের বিত্তানুরূপ হওয়া আবশ্যক। শাস্ত্র বলিয়াছেন, "বিত্তশাঠ্যং ন কর্ত্তব্যম্" তাহাকে অর্পণ করার সময় কৃপণতা করিবে না। নিজের বেলায় ১০ হাত ও তাঁহার বেলায় ৪ হাত কাপড়ের ব্যবস্থা করিলে চলিবে না, তাহাতে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, প্রত্যুত তাঁহাকে লইয়া বিড়ম্বনা করার জন্য নিজের সর্ব্বনাশ সংসাধিত হইবে এবং বিষয়ে আরও জড়িত হইয়া পড়িতে হইবে। আজ কাল প্রায় স্থানেই এই প্রকার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে কর্ত্তার বাড়ীতে পূজায় নৃত্যগীতাদিতে সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয়িত হইতেছে, সেখানেও যত অব্যবহার্য্য জিনিষই তাঁহার সেবা ও পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট। যাহার দুই খানি কাপড় দেওয়ার সংস্থান নাই, তিনি বরং একখানি ব্যবহারের উপযুক্ত কাপড় দিবেন, তথাপি এই প্রকার বিড়ম্বনা-রূপ পূজা কখনও করিবেন না। যত নিকৃষ্ট ও সুলভ মূল্যের জিনিষ, তাহাই পূজা ও শ্রাদ্ধাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাস্তবিক এই প্রকার ব্যবস্থা দ্বারা আমরা নিজেই বঞ্চিত হইতেছি। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, যাঁহার রোম কূপে অবস্থিত, তিনি তোমার আমার পূজার জন্য লালায়িত নহেন। পূজার (উপাসনার) যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য, বিষয়ানুরাগ-

নিবৃত্তি পূর্ব্বক ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ তন্ময়ত্ব লাভ করা, তৎপ্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

এই জন্যে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

কালিকা মাত্মবৎ পশ্যেৎ তথা সেবেত চাত্মবৎ।

নিজ ইষ্টদেবতাকে নিজের ন্যায় দেখিতে হইবে ও সেই ভাবে পরিচর্য্যা করিতে হইবে। যদি উপাসনার প্রকৃত ফল লাভের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এই রূপই করিতে হইবে। যিনি অকপট চিত্তে ভক্তি-ভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা করিবেন, তিনিই প্রকৃত ফল-লাভের অধিকারী। ভক্তি ভিন্ন "লোক দেখান" ভাবে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় অর্পণ করিলে, কোন ফল-লাভ হইবে না এজন্য বলিয়াছেন, লোকে নিজের যে ভাবে সেবা করে, তাঁহারও ঠিক্ সেই ভাবে করিবে। এ সংসারে নিজ অপেক্ষা আর প্রিয়তম বস্তু নাই, জীবগণ স্বভাবতই নিজের প্রতি অনুরক্ত হয়। লোকের নিজের প্রতি যেরূপ অনুরাগ তাঁহার প্রতি তদনুরূপ অনুরাগ জন্মাইয়া পরিচর্য্যা করিতে হইবে। ভক্তি—অনুরাগ একান্ত আবশ্যক, তাই সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি গীতা বলিয়াছেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যোমে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নামিপ্রযতাত্মনঃ।

৯ম অঃ ২৬ শ্লোক।

পত্র, পুষ্প, ফল বা জল ভক্তি-পূর্ব্বক যিনি যাহা আমাকে দান করেন, আমি তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি।

ফলতঃ ভক্তিই ভগবদুপাসনার মূল উপাদান। তাঁহার প্রতি ভক্তি—অনুরাগ হইলে আর অব্যবহার্য্য নিকৃষ্ট বস্তু অর্পণ করিতে চিত্তে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। যিনি তাঁহার প্রতি যে পার্থিব সম্বন্ধ লইয়া উপাসনা-

রাজ্যে প্রবিষ্ট হইবেন, তিনি সত্য সত্যই সেই ভাবে পরিচর্য্যা করিবেন। মাতৃসাধক তাঁহাকে অকল্পিত মাতৃ-ভাবে ও পিতৃ-সাধক অকল্পিত পিতৃ ভাবে দেখিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-দায়ক দ্রব্য ভোগ করাইয়া, নিজের ভোগ-সুখ অনুভব করিয়া থাকেন এবং প্রসাদ স্বরূপ পরাভক্তি সহকারে অর্পিত দ্রব্য সকল, ভোগ করিয়া ধন্য হন। এরূপ ভোগের দ্বারা আত্মার কোন অনিষ্ট হয় না, ক্রমে বিষয়ানুরাগ ক্ষীণ হইয়া, তাঁহার অনুরাগে পরিণত হয় এবং সাধক, অবশেষে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন।

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আসক্তি, ঈশ্বরাভিমুখী করিবার আর একটী প্রকৃষ্ট উপায়—যখন যেখানে চক্ষুরিন্দ্রিয় আকৃষ্ট হয়, সেখানেই তাঁহার সত্তার অনুভব করা। মাতৃ-সাধক কমলাকান্ত গাহিয়াছিলেন—

সুগম সাধন্ বলি তোরে,
ওরে আমার মূঢ় মন! সাধরে।
যখন যেখানে সুখে থাক মন! তাতেই ভা'ব মারে॥
যদি না থাকিতে পার, মন!
চিন্তামণি পুরে--
চরাচরে শ্যামা মা মোর, সকলে সঞ্চরে॥
স্থলে অনলে শূন্যে আছে,
মা মোর, সলিলে সমীরে।
ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী শ্যামা-মা'রে জান না রে॥
ঘটে আছে, পটে আছে,
মা মোর সর্ব্ব শরীরে;
কামিনীর কটাক্ষে আছে, তেঁই জগতের মন্ হরে॥
কমলা কান্তের মন্! ভয় করেছ কারে।
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত নিধি, ঘটেছে তোমারে॥

বাস্তবিকই ইহা অতি সুগম সাধন তাঁহার অভাব কুত্রাপি নাই, কিন্তু আমাদের কলুষিত চিত্ত তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না ; এজন্য প্রথমতঃ চিত্তহরদৃশ্য পদার্থে তাঁহার আবির্ভাব ও অস্তিত্ব দেখিতে শিক্ষা করিতে হইবে ; ক্রমে সর্ব্বভূতে জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফুর্ত্তি ॥

চৈতন্য-চরিতামৃত।

সাধক, স্থাবর-জঙ্গম যাহা কিছু দেখেন, সেখানেই স্থাবর-জঙ্গমের রূপ না দেখিয়া তাঁহার ইষ্ট-দেবতার মূর্ত্তি দেখেন।

ভগবান্‌ও গীতার দশম অধ্যায়ে বিভূতিবর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিত মেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ-সম্ভবং ॥ ৪১

যাহা কিছু বিভূতিমৎ, শ্রীমৎ, এবং উর্জ্জস্বল বস্তু দেখিবে, তাহাই আমার তেজের অংশ সম্ভব বলিয়া জানিবে।

পরে জ্ঞানের পরিপক্কাবস্থায় তাঁহাকে সাধক সর্ব্বভূতে দেখিতে পান, এজন্য পরের শ্লোকে অর্জ্জুনকে উত্তম অধিকারী জানিয়া বলিলেন—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ ॥ ৪২

অথবা হে অর্জ্জুন! অধিক জানিবার আর প্রয়োজন কি, সংক্ষেপে এই মাত্র জানিয়া রাখ যে, আমি এক অংশ দ্বারায় এই সমস্ত জগৎই ব্যাপিয়াই রহিয়াছি।

"অথবা" শব্দ দ্বারা ভগবান্ ইহাই সূচনা করিলেন যে, তাঁহার কথিত পূর্ব্বোল্লিখিত বিভূতি সকল জ্ঞাত হইয়া অল্পাধিকারিগণ জ্ঞান লাভ করিবে, কিন্তু অর্জ্জুনকে জ্ঞানী জানিয়া তিনি বলিলেন যে, তোমার এত ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি জানিবার প্রয়োজন নাই, আমি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়াই আছি।

যিনি প্রকৃত জ্ঞানী সাধক, তিনি শ্মশানে ও গৃহে, কাঞ্চনে ও তৃণে সর্ব্বত্র তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন ও ঐশী শক্তির উপলব্ধি করিয়া থাকেন। তিনি প্রতি পুষ্পে প্রতি পত্রে তাঁহাকে দেখেন, কুত্রাপি তাঁহার অভাব দেখিতে পান না।

আমি কৃষ্ণ ময় জগৎ দেখি।
বৃক্ষ মূলে শাখা, শিখি পুচ্ছ পাখা
কৃষ্ণ রূপ মাখা মাখি।
যে সময় আমি যে স্থানেতে যাই,
অধ ঊর্দ্ধ আদি দশ দিকে চাই,
কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য দেখিতে না পাই,
আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি।
নয়ন মুদিয়ে থাকি যে সময়,
হৃদি মাঝে কৃষ্ণ রূপ দৃষ্ট হয়। ইত্যাদি।

অবশ্য এ অবস্থা লাভ করিতে হইলে ভগবদুপদেশ অনুসারে যেখানে শোভা-সম্পৎ ও কান্তির সমধিক বিকাশ, সেখানেই প্রথমতঃ তাঁহার সত্তা দেখিতে অভ্যাস করিতে হইবে এবং দৃশ্য বস্তুর সৌন্দর্য্য তাঁহারই সৌন্দর্য্য বলিয়া ধারণা করিতে হইবে।

এজন্যই হিন্দু, জ্যোতির আধার সূর্য্যমণ্ডলে সেই বিশ্বরূপকে দর্শন করিয়া "সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ" সূর্য্য সমস্ত জগতের আত্মা স্বরূপ।—

এই জ্ঞানে সূর্য্য-মণ্ডলাধিষ্ঠিত চৈতন্যের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং নমস্ত্রৈলোক্য-নাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ।

ত্বং জ্যোতিস্ত্বং দ্যুতি ব্রহ্মত্বং বিষ্ণুস্ত্বং প্রজাপতিঃ।

ত্বমেব রুদ্রো রুদ্রাত্মা বায়ুরগ্নিস্ত্বমেবচ।

ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্য-দেবকে প্রণাম করেন। বাস্তবিক তাঁহার সত্তার কোন স্থানে অভাব নাই, তবে সূর্য্যমণ্ডলে ঐশ্বরিক বিভূতির সমধিক বিকাশ, তাই সূর্য্যমণ্ডলোপহিত চৈতন্যের উপাসনা। ভগবান্ও এই জন্য প্রথম অধিকারীর পক্ষে বলিয়াছেন—

"জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্"

গীতা ১০ম অঃ ২০ শ্লোকের অংশ।

অগ্নি আদি যত জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রকাশের আধারভূমি সূর্য্যই তিনি। সমস্ত পদার্থই তাঁহার বিভূতিময় সত্য, কিন্তু যাহাতে বিশেষ বিশেষ বিভূতির প্রকাশ, সেই খানেই ভগবানের সত্তা অনুভূত হইয়া থাকে; এই অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন "প্রকাশকগণের মধ্যে আমি সূর্য্য।"

উপরে যাহা লিখিত হইল, তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে চক্ষু-রিন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বিষয়গুলি নিম্নলিখিত উপায়ে ভগবানে সমর্পণ করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বৃত্তি, ঈশ্বরাভিমুখী করিতে হইবে।

(১) ভগবানের মূর্ত্তি ও আলেখ্যাদি সম্মুখে রাখিয়া বার বার দৃষ্টি করা ও তদনুরূপ মূর্ত্তি, মানস-পটে ধ্যান করা।

(২) যে সকল দৃশ্য পদার্থ দ্বারা আমরা বিষয়ে সংলিপ্ত হই, তাহা ভগবানে সমর্পণ করিয়া, তাঁহার প্রসাদ-লব্ধ বস্তু নিজে ভোগ করা।

(৩) দৃশ্য পদার্থে তাঁহার মহিমার ও সত্তার উপলব্ধি করা।

এই প্রকার অভ্যাস দ্বারা ক্রমে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়ে বাসনা ক্ষীণ

হইতে থাকিবে এবং চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বৃত্তি, ভগবানে সম্যক্ প্রকারে অর্পিত হইবে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের পরিচালনা, আমার নিজের জন্য নহে, সমস্তই তাঁহার জন্য এবং তাঁহারপ্রদত্ত সংসার-যাত্রানির্ব্বাহ করার জন্য, এই ভাবটীও ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হইবে।

(২) কর্ণেন্দ্রিয়।

সর্ব্বদা ভগবদ্‌গুণাবলী-শ্রবণ এবং তদ্-বিষয়ক গীত-বাদ্যাদি-শ্রবণ করিয়া, কর্ণেন্দ্রিয়ের বিষয় তাঁহাকে অর্পণ করিতে হইবে। তাঁহার গুণ ও মহিমা-প্রকাশক গীত বাদ্যাদি দ্বারা বিষয়ে আবদ্ধ না হইয়া জীব, তাঁহার ভাবে আত্মহারা হইয়া, ক্রমে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। সৎকথা, সদালাপ ও সদ্‌গ্রন্থ-শ্রবণ সাধনার একটী প্রধান অঙ্গ; বার বার এই সকল শ্রবণ করিলে কর্ণেন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্ত হয়, তখন আর ভগবৎ-কথা ভিন্ন অন্য কিছু শুনিতে ও বৃথা তর্কে সময় কাটাইতে প্রবৃত্ত হয় না। আজ কালে সকল বিষয়েই আমরা তর্ক দ্বারা মীমাংসা করিতে চাহি; বাস্তবিক আধ্যাত্মিক রাজ্যে তর্কের কোন ও প্রতিষ্ঠা নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া।

তর্কের দ্বারা তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করা যায় না। ভগবান্ বাদরায়ণ, ব্রহ্মসূত্রে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দেখাইয়াছেন। উহার ভাষ্যে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন —লোকে বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যে তর্ক উত্থাপন করে, সে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই; কারণ, এক বুদ্ধিমানের অনুমোদিত তর্ক, অপর বুদ্ধিমান্ নিরাস করেন। পক্ষান্তরে তাঁহার তর্কও তৃতীয় বুদ্ধিমান্ কর্ত্তৃক খণ্ডিত হয়। অতএব তর্কের শেষ কোথায়?

নারদ ভক্তিসূত্রে বলিয়াছেন—

বাদো নাবলম্ব্যঃ ॥৭৫॥

ভক্তি-মার্গে বাদ অর্থাৎ শুষ্কতর্ক একান্ত বর্জ্জনীয়। অপ্রত্যক্ষ ও অনমুমেয় বিষয়ে তর্ক নিষ্প্রয়োজন ও অবলম্বনীয় নহে।

বাহুল্যাবকাশত্বাদনিয়তত্বাচ্চ ॥৭৬॥

তর্ক ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া সময়ের অপব্যয় ঘটায়, বিশেষতঃ উহার প্রতিষ্ঠা নাই। তর্ক দ্বারা কখনই পরমার্থ-তত্ত্ব নির্ণয় হইতে পারে না। এজন্য প্রতিকূল তর্ক শ্রবণ ও তাহাতে যোগদান করা একান্ত অকর্ত্তব্য। কর্ণেন্দ্রিয়ের বৃত্তি তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হইলে, শুষ্কতর্ক শ্রবণ করা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে হইবে এবং গুরু ও বেদান্ত বাক্য অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্য শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে হইবে। প্রচলিত কথায় বলে—

"বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর।"

এজন্য কুতর্ক ও কুকথা, যাহাতে চিত্ত কলুষিত হয়, তাহাতে কর্ণের বৃত্তি নিয়োজিত করিবে না। ভগবৎপ্রসঙ্গ ও সৎকথা শ্রবণ করিয়া কর্ণেন্দ্রিয়ের বৃত্তি তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হইবে।

আর্য্য শাস্ত্রে কর্ণেন্দ্রিয়ের শ্রবণ-বৃত্তি, সাধন-মার্গের একটী প্রধান সহায় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ভক্ত বীর প্রহ্লাদ পিতাকে বলিয়াছেন—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ-সেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নব-লক্ষণা॥
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

ভাঃ ৭।৫।২৩।২৪

অধীতী ব্যক্তি যদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন,

দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন, এই নবলক্ষণাক্রান্ত ভক্তি, ভগবান্ বিষ্ণুতে সমর্পণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন, আমার বোধ হয় তাহাই উত্তম শিক্ষা।

শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পরম পুরুষার্থ পুরুষার্থসীমা॥ চৈতন্য-চরিতামৃত।

চৈতন্যোক্ত পঞ্চাঙ্গ সাধন মধ্যে ভাগবত-শ্রবণ অর্থাৎ তাঁহার গুণাবলিযুক্ত সৎকথা শ্রবণও সাধনার একটী অঙ্গ।

সাধুসঙ্গ, নাম-কীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরা-বাস, শ্রীমুর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন।
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ।
এক অঙ্গ সাধে—কেহো সাধে বহু অঙ্গ
নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ॥

চৈতন্য-চরিতামৃত।

অবশ্য সাংসারিক জীবের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, ভগবৎ প্রসঙ্গ ভিন্নও অন্যান্য নানা প্রকার কথা শ্রবণ করিতে হয়, কিন্তু যে সাধক এই সংসার "তাঁহার (ভগবানের) সংসার" মনে করিয়া তাঁহার আজ্ঞা-প্রতিপালনের জন্য সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট সমস্ত কথাই ভগবৎ-কথা। এজন্য সাধক প্রবর রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন—

যত শোন কর্ণপুটে সকলি মায়ের মন্ত্র বটে।
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে॥

এ ভাব আয়ত্ত করিতে হইলে উচ্চ অঙ্গের সাধক হওয়া আবশ্যক, কিন্তু যিনি সাধন পথের পথিক এবং কায়মনো-বাক্যে ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহার কাছে এরূপ উচ্চ ভাব সুদুর্লভ নহে।

তিনি শব্দব্রহ্ম। এ সংসারে যাহা কিছু ধ্বনিত ও উচ্চারিত হইতেছে তাহার গোড়ায় তাঁহার শক্তি। তিনি প্রত্যেক মানব-দেহে কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে বিরাজিত। আমরা যাহা কিছু উচ্চারণ করিয়া থাকি, সমস্তই এই শক্তির বিকাশ মাত্র। এজন্য সাধক বলিতেছেন—"কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী"; কারণ, অকারাদি ক্ষকারান্ত সমস্ত বর্ণশক্তি সেই অনন্ত শক্তির বিকাশ।

(৩) ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের যাহা কিছু মনোরম বিষয় এবং যে সকল বস্তুর ঘ্রাণের জন্য চিত্ত লালায়িত, সেই সকল বস্তু আহরণ পূর্ব্বক নিজের ইষ্ট দেবকে সমর্পণ করিয়া, তাঁহার প্রসাদ স্বরূপ তাহা ভোগ করিলে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয়ে আসক্তি ক্ষীণ হইতে থাকে। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ধূপ গুগ্‌গুল্ কর্পূরাদি গন্ধ দ্রব্য দ্বারা তাঁহাকে আমোদিত করিয়া সাধক, তৎসঙ্গে নিজেও গন্ধ উপভোগ করিতে পারিবেন। তাঁহার এইরূপ উপভোগ সাত্ত্বিক ভাব ও জ্ঞান মূলক; কারণ সাধক সাত্ত্বিক ভাব প্রণোদিত হইয়াই গন্ধ দ্রব্যের আহরণ করিয়া থাকেন। এই সকল কার্য্যের মূলে ভগবানের প্রতি ভালবাসা মিশ্রিত থাকায় ও তাঁহার জন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করায় এইরূপ কর্ম্ম তাঁহাকে অর্পণ করা হয়। কাজেই কর্ম্মের সংস্কারবীজ সঞ্চিত হইয়া জন্মান্তর সংঘটন করায় না। মানুষ নিজ ভোগ-বিলাসের জন্য যাহা কিছু করে, সেই সব কার্য্যের বীজ, তাহাকে জন্মান্তরে বিষয়ে ব্যাপৃত রাখে। যদি কোন ব্যক্তি নিজের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য মনোহর পুষ্পের উদ্যান করেন, তাহা হইলে এইরূপ কর্ম্মের মূলে "অহং মম" ভাব থাকায় ঐকর্ম্ম অভিমান-মূলক হইবে; আবার ইষ্টদেবতার ভোগের জন্য করিলে সেই কর্ম্মের মূলে ঐশ্বরিক প্রীতি থাকায় চিত্তের বিষয়-বাসনা

ক্রমে তিরোহিত হইয়া চিত্ত-শুদ্ধি হইতে থাকিবে। বাসনাই চিত্তের মল, বাসনা অর্থাৎ "আমি ও আমার" এই প্রকার ভাব যত বিনষ্ট হইবে, চিত্ত, ততই মেঘ-মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল হইতে থাকিবে।

কিরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি ভগবানে অর্পণ করিতে হয়, তাহা শুকদেব, অম্বরীষ-চরিত্রে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণ-পদারবিন্দয়োর্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দির-মার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুত-সৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দ লিঙ্গালয় দর্শনে দৃশৌ, তদ্ভৃত্যগাত্রস্পরশেঽঙ্গ সঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদ-সরোজ-সৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্র-পদানুসর্পণে শিরোহৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কাম-কাম্যয়া যথোত্তমশ্লোক-জনাশ্রয়া রতিঃ॥

(ভাঃ ৯। ৪। ১৮—২০

তাঁহার মন, শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে; বাক্য বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণণে; করদ্বয়, হরিমন্দির-মার্জ্জনাদিতে; শ্রবণেন্দ্রিয়, অচ্যুতের সৎকথা-শ্রবণে; নয়নদ্বয়, যে যে গৃহে বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে তাহার দর্শনে, অঙ্গ-সমূহ, ভগবদ্-ভৃত্য জনের গাত্রস্পর্শে; ঘ্রাণেন্দ্রিয় ভগবৎ-পাদ-পদ্ম-সংলগ্ন তুলসীর সৌরভ-গ্রহণে এবং রসনা, ভগবানের প্রতি নিবেদিত অন্নাদির আস্বাদনে নিযুক্ত হইয়াছিল। তিনি চরণদ্বয়কে ভগবৎক্ষেত্র- পদানুসর্পণে এবং মস্তককে হৃষীকেশ চরণ-বন্দনে প্রবৃত্ত রাখিয়াছিলেন। ভগবানের প্রসাদ-স্বীকার উচিত বোধ করিয়া ভগবদ্ভক্তের প্রতি আসক্তি রাখিয়া, তদনুসারে বিষয় ভোগ করিতেন; লোভবশতঃ করিতেন না। সর্ব্বত্র আত্মা আছেন—ভাবিয়া ক্রিয়া কলাপ করিতেন। কর্ম্মের ফল ভগবান্ যজ্ঞেশ্বর অধোক্ষজে সমর্পণ করিতেন।

শাস্ত্রে গন্ধদ্রব্যের নানারূপ ভেদ কথিত আছে।

অগুরুশীর গুগ্‌গুলৈঃ শর্করা মধুচন্দনৈঃ ;
সামান্যঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ।
সর্ব্বেষামেব ধূপানাং দুর্গায়া গুগ্‌গুলঃ প্রিয়ঃ।
ঘৃতযুক্ত বিশেষেণ সততং প্রীতি-বর্দ্ধনঃ।

(শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ১৪শ উল্লাস)

অগুরু, বীরণ-মূল, গুগ্‌গুল, শর্করা মধু ও চন্দন এই সকল মিশ্রিত করিয়া ধূপ নির্ম্মাণ করিলে, তদ্দারা সকল দেবতারই পূজা করা যাইতে পারে। সর্ব্ববিধ ধূপের মধ্যে গুগ্‌গুল্ দুর্গাদেবীর বিশেষ প্রীতিকর। গুগ্‌গুল্, ঘৃতযুক্ত করিয়া তদ্দারা ধূপ প্রদান করিলে, দুর্গাদেবী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতিলাভ করেন—অর্থাৎ দুর্গাপূজায় যে সকল ভাবের পরিপুষ্টি আবশ্যক, এই ধূপের গন্ধে তাহার বিশেষ সাহায্য করে, এজন্য দুর্গাদেবীর প্রীতিকর বলিয়াছেন। ষোলটী দ্রব্য একত্র করিয়া এক প্রকার ধূপ প্রস্তুতের ব্যবস্থা আছে, ঐ প্রকার গন্ধ-দ্রব্যকে ষোড়শাঙ্গ ধূপ বলে। ইহার গন্ধ, চিত্তের একাগ্রতা ও সাত্ত্বিক-পবিত্র-ভাব-লাভের বিশেষ সহায়তাকারী। এই সকল দ্রব্যসংগ্রহের চেষ্টা, তাঁহার সম্বন্ধে অর্পিত হওয়ায় ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বৃত্তি তাঁহাতেই সমর্পণ করা হয়। যে সকল গন্ধ-দ্রব্য রাজস ও তামস অর্থাৎ যদ্দারা চিত্তের মলিন কুপ্রবৃত্তিগুলি উত্তেজিত হয়, তাহা দেব পূজায় অগ্রাহ্য সুতরাং সাধকেরও গ্রহণীয় নহে। কারণ সাধক কোন গন্ধ দ্রব্যই ইষ্ট-দেবতার প্রসাদ ভিন্ন গ্রহণ করেন না। তিনি যাহা কিছু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা তাঁহার ইষ্ট-দেবতার প্রসাদ-স্বরূপে, ভক্তিভাব প্রণোদিত হইয়াই, গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রে এইজন্য অনিবেদিত-দ্রব্য ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ফলং পুষ্পঞ্চ তাম্বূলমন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
অদত্ত্বা তন্মহাদেব্যৈ ন ভোক্তব্যং কদাচন॥

অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ।
দেব্যাশ্চাষ্টশতং মন্ত্রং জপ্ত্বা পূতো ভবেন্নরঃ।
(কালিকাপুরাণ)

ফল, পুষ্প, তাম্বূল, অন্ন, পানীয়াদি কোন দ্রব্যই ইষ্টদেবতাকে নিবেদন না করিয়া কদাচ ভোগ করিবে না। নিবেদন না করিয়া ভোগ করিলে, ভোক্তা, প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়। সে অষ্টোত্তর শত ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া পূত হইবে। তাৎপর্য্যার্থ এই যে, বাসনামূলক বিষয় ভোগদ্বারা চিত্তে অভিমান উত্তেজিত হইয়া সে রজস্তমোরূপ কালিমা জন্মিবে তাহা ইষ্টদেবের নাম জপ দ্বারা অপনোদনপূর্ব্বক সাত্ত্বিক ভাব অবলম্বন করিতে হইবে। অভিমানই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। অভিমান নষ্ট করাই হিন্দুর উপাসনার লক্ষ্য। যদি কোন কারণে অভিমানের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে সাত্ত্বিক-ভাব-বৃদ্ধি করিয়া অভিমানকে খর্ব্ব করার নিমিত্তে শাস্ত্র ব্যবস্থা দিয়াছেন। এখানে মূলে "দেব্যাঃ" শব্দে নিজ নিজ ইষ্টদেবতা বুঝিতে হইবে। শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীকার লিখিয়াছেন—
"দেব্যা উপলক্ষণং স্বস্বোপাসিত- মন্ত্রপরং।"

এই প্রকারে সংসারে যাহা কিছু মনোরম গন্ধ-দ্রব্য আছে, সমস্তই ইষ্টদেবতাকে অর্পণ করিয়া ভোগ করিবে এবং প্রসাদ ভিন্ন নিজের বিলাসিতার জন্য কোন গন্ধ দ্রব্য ভোগ করিবে না। ইহাই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় সমর্পণ-প্রণালী।

(৪) রসনেন্দ্রিয়।

"অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যদ্দেবায়ানিবেদিতম্।"

যে ভক্ষ্য দ্রব্য, দেবতাকে নিবেদন করা হয় নাই, তাহা বিষ্ঠা, আর পেয় দ্রব্য নিবেদিত না হইলে মূত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। রসনেন্দ্রিয়ের

বৃত্তি, নিজ ইষ্ট-দেবতাকেসমর্পণ করায় উপায়, শাস্ত্র এইভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; নিজের যাবতীয় ভক্ষ্য দ্রব্য তাঁহাকে অর্পণ করিয়া তাঁহার প্রসাদ-জ্ঞানে উহা পরমভক্তি সহকারে গ্রহণ করিবে, ইহাই রসনেন্দ্রিয়ের বৃত্তি সমর্পণ প্রণালী। সাধক কোন দ্রব্য তাঁহার প্রসাদ ভিন্ন গ্রহণ করেন না ; যাহা কিছু রসনেন্দ্রিয়ের উপভোগ্য নিজের প্রিয় দ্রব্য আছে, তাহা অতি যত্ন সহকারে ও পবিত্র ভাবে আহরণ পূর্ব্বক নিজ ইষ্ট-দেবতার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া অতি দীনভাবে আত্মনিবেদন করিয়া বলেন' 'প্রভো, আমার যাহা কিছু আছে সমস্তই তোমাকে অর্পণ করিলাম, তুমি গ্রহণ করিয়া আমাকে চরিতার্থ কর।" পরে প্রসাদ দ্রব্য, অতি ভক্তি-ভাবে নিজে গ্রহণ করিয়া নিজের তৃপ্তি-সাধন করেন। সাধক নিজের জন্য কিছুই করেন না, সমস্তই তাঁহার ইষ্টদেবতার তৃপ্তির জন্য করিয়া থাকেন।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভূঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

গীতা ৩ অঃ ১৩ শ্লোক।

যাঁহারা দেবযজ্ঞাদি-সমাপনান্তে তদবশিষ্ট ভোজন করেন, সেই সাধুগণ সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন, আর দুরাত্মগণ নিজের উদর-পূর্ত্তিমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া পাকাদি করে, তাহারা পাপই ভোজন করে। তাৎপর্য্যার্থ এই, যে মানব অহং ভাবাপন্ন হইয়া আহার করে, সে ঐ আহার-ক্রিয়ার সংস্কার দ্বারা আবদ্ধ হয় এবং তাহার অহং ভাব (অভিমান) আরও পরিপুষ্ট হয় সুতরাং সে পাপ ভোজন করে।

রসনেন্দ্রিয়ের ভোগ্য দ্রব্য ইষ্টদেবে সমর্পণপূর্ব্বক ভোগ করিলে, সাধক বিষয়ে বদ্ধ হন না ; তিনি প্রসাদ-জ্ঞানে ভোগ করায় তাঁহার ভক্তি প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া বিষয়ে আসক্তি ক্ষীণ

হইতে থাকে, অবশেষে তিনি সমস্ত-আসক্তি-শূন্য হইয়া পড়েন। কিন্তু যাহা নিজের প্রিয়তম বস্তু, যদ্দ্বারা সাধক নিজে আসক্ত হন, সেই প্রকার ভোগ্য বস্তুই ভগবানকে অর্পণ করিতে হইবে। নিজের বেলায় ক্ষীর, সর, নবনীত আর তাঁহার বেলায় মনুষ্যের অখাদ্য দ্রব্য, এইরূপ ব্যবস্থা করিলে চলিবে না; তদ্দ্বারা রসনেন্দ্রিয়ের বৃত্তি-সমর্পণ হইবে না, বরং আত্মা আরও পঙ্কিল হইয়া পড়িবে।

শাস্ত্রও বলিয়াছেন—

যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি প্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্প্যতে॥

যাহা সকলের প্রিয় বস্তু ও যাহা নিজের প্রিয়তম, তাহা আমাকে নিবেদন করিবে। তাহাতে, অনন্ত ফল হইয়া থাকে।

নাভক্ষ্যং দত্ত্যাং নৈবেদ্যং।

যাহা নিজের ভক্ষ্য নহে, তাহা ইষ্টদেবকে নিবেদন করিবে না।

নিজ ইষ্টদেবকে ভক্ষ্য-দ্রব্য-সমর্পণকালে নিজের ভাব পরিশুদ্ধ থাকা আবশ্যক। ইহা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সমর্পণ কালেই আবশ্যক। ভাব ভিন্ন কোন কার্য্য হয় না।

"ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ"

তিনি সাধকের যে সরল দীনভাব, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি তোমার-আমার আলোচা'লের জন্য লালায়িত নহেন! তিনি চাহেন, তোমার আমার ভাব ও অনুরাগ। তাঁহার কিছুরই অভাব নাই সত্য, কিন্তু যিনি ভক্ত তিনি নিজ ইষ্টদেবের অভাব আছে কিনা— তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন কেন? যেমন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির অনুগত প্রজা, নিজ পরিশ্রমলব্ধ অতি সামান্য উপঢৌকন উপস্থিত করিয়া নিজে তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে, তাহার প্রভু সে সকল জিনিষ চাহেন কিনা, তৎ

প্রতি দৃষ্টি করে না, সেইরূপ আমার যাহা প্রিয়, সমস্তই আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত করিব এবং আমি কোন দ্রব্য তাঁহাকে নিবেদন না করিয়া নিজে গ্রহণ করিব না ; তিনি ভক্তবাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন ; আমার হৃদয়ের অনুরাগ তাঁহার প্রতি সমর্পিত হইলে, তদ্দ্বারা আমার ফল-লাভের তারতম্য হইবে না। যাঁহার অন্তরে প্রগাঢ় ভক্তি আছে, তিনি যাহা কিছু ভাল বাসেন সমস্তই ইষ্টদেবতার চরণে সমর্পণ না করিয়া স্থির থাকিতে পারিবেন কেন ? আহার সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য তিনি পরার্থে—নিজ ইষ্টদেবতার জন্য—নিয়োগ করেন এবং তৎসহ যাহাতে আহার-শুদ্ধি হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন ; কারণ আহারশুদ্ধি ব্যতীত সাধন ভজন কিছুই হয় না, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রপ্রতিপাদিত সত্য।

আহার শুদ্ধ্যা নৃপতে ! চিত্তশুদ্ধিস্তু জায়তে।
শুদ্ধে চিত্তে প্রকাশঃ স্যাদ্ধর্ম্মস্য নৃপসত্তম ॥

দেবী-ভাগবত ৬।১১।৫০

হে নৃপসত্তম ! আহারশুদ্ধি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় অর্থাৎ চিত্তে সাত্ত্বিকভাব আসে ; চিত্তশুদ্ধি হইলে তাহাতে ধর্ম্ম, পরিস্ফুট রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আর্য্যশাস্ত্র অনুসারে 'ধর্ম্ম' কাহাকে বলে, তাহা আলোচনা করিলেই আহারশুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্মের কিরূপে উন্নতি হয়, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। ভারতীয় ধর্ম্ম, কোন কাল্পনিক পদার্থ নহে। যাহা আছে বলিয়া মনুষ্য, 'মনুষ্য' নামে অভিহিত হয়, যাহা না থাকিলে মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না, তাহাই আর্য্যশাস্ত্রানুসারে মনুষ্যের ধর্ম্ম। "ধৃঙ্ অবস্থানে"এই ধাতুর উত্তর "মন্" প্রত্যয় দ্বারা 'ধর্ম্ম'পদ সাধিত হইয়াছে। যাহার জন্য বস্তুর অবস্থিতি এবং যাহা না থাকিলে বস্তুর অবস্থিতি থাকে না, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। যেমন অগ্নির ধর্ম্ম তাপ, জলের ধর্ম্ম

শৈত্য, মনুষ্যের ধর্ম্ম মনুষ্যত্ব। মহর্ষি মনু, মনুষ্যের প্রধান দশটী ধর্ম্ম এই প্রকারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥

(১) ধৃতি—অর্থাৎ ধারণা করা, স্মরণ রাখিবার শক্তি। কোন একটীমাত্র বিষয় দেখিয়া বা শুনিয়া সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিবৃত্তি হয় না। দর্শন জন্য পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের তাদৃশী গতি, কিঞ্চিৎ কালের জন্য নিরোধ করিলে, ঐ দর্শন বা শ্রবণক্রিয়াজনিত একটী সংস্কার বা মনোমধ্যে যে একটী রেখা অঙ্কিত হয় অর্থাৎ যদ্দ্বারা ঐ দর্শন বা শ্রবণ ক্রিয়াটি পুনর্ব্বার স্মৃতিরূপে মনে উপস্থিত হইতে পারে, সেই শক্তির নাম ধৃতি। (২) ক্ষমা—কেহ অপকার করিলে তাহার প্রত্যপকারে যে প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তিকে যে শক্তি দ্বারা নিরোধ করা যায়। (৩) দম—শোকতাপাদি দ্বারা কোন প্রকার চিত্তবিকৃতি উপস্থিত হইলে, যে শক্তি দ্বারা ঐ প্রবৃত্তির নিরোধ করা যায়। (৪) অস্তেয়—অবিধিপূর্ব্বক পরস্ব গ্রহণের প্রবৃত্তিকে যে শক্তি দ্বারা নিরুদ্ধ করা যায়। (৫) শৌচ শরীর ও চিত্তের নির্ম্মল-ভাব রূপ শক্তি। (৬) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—যে শক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিরুদ্ধ করা যায়। (৭) ধী-শক্তি—শাস্ত্রাদি দ্বারা বস্তুর তত্ত্ব-নিশ্চয়-শক্তি। (৮) বিদ্যা—যে শক্তি দ্বারা অন্তরস্থ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার আন্তরিক প্রত্যক্ষ করা যায়। এইটী সর্ব্বোচ্চ পরম ধর্ম্ম। ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্" যোগ দ্বারা আত্মার দর্শন করাই পরমধর্ম্ম। এই ধর্ম্মটীর স্ফুরণ হইলেই মনুষ্যের উন্নতির চরমাবস্থা হয়, মনুষ্য কৃতকার্য্য হয়। এজন্য এইটীই মনুষ্যের, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। (৯) সত্য—কায়,

মন ও বাক্য দ্বারা সম্পূর্ণ যথার্থ আচরণ করা। (১০) অক্রোধ—যে শক্তি দ্বারা ক্রোধকে নিরোধ করা যায়। (পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির ধর্ম্মব্যাখ্যা নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত) ইহা ভিন্ন বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, সন্তোষ প্রভৃতি আরও কতকগুলি ধর্ম্ম আছে।

যে আহারের দ্বারা এই সকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পুষ্টিলাভ হয় এবং ঈর্ষ্যা, অসূয়া, হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি অধর্ম্মপ্রবৃত্তি ক্ষীণ হয়, তাহাই শাস্ত্রবিহিত। আহার-সংযম না হইলে সাধন ভজন কিছুই হয় না, এজন্য হিন্দুশাস্ত্রে আহার সম্বন্ধে এত বিধি-নিষেধ। উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ভক্ষণে রজ ও তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চিত্তের চাঞ্চল্য জন্মায় এবং নানা প্রকার কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, সুতরাং ঐরূপ দ্রব্য সম্যক্ পরিহার করিতে হইবে। যাহা সত্ত্বগুণের বিরোধী, তাহা কদাচ সেবনীয় নহে; এজন্য যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

পলাণ্ডুং বিড়্ বরাহঞ্চ ছত্রাকং গ্রাম কুক্কুটম্।
লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব জগ্ধ্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥

পেঁয়াজ, গ্রাম্য শূকর, বেঙের ছাতা, গ্রাম্য কুক্কুট, রসুন, গাঁজর, এই সমস্ত ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এই সকল দ্রব্যের কামোদ্দীপক ও তমোগুণবর্দ্ধক শক্তি অত্যন্ত বেশী এবং তাহা আধ্যাত্মিক উন্নতির বিশেষ অন্তরায় বলিয়া ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারগণ বিশেষ-ভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

ভগবান্ মনুও পঞ্চমাধ্যায়ে এই কথাই বলিয়াছেন—

ছত্রাকং বিড়্ বরাহঞ্চ লশুনং গ্রাম-কুক্কুটম্।
পলাণ্ডুং গৃঞ্জনঞ্চৈব মত্যা জগ্ধ্বা পতেদ্দ্বিজঃ ॥

মনু ৫।১৯

ছত্রাক (বেঙের ছাতা) গ্রাম্য শূকর, রসুন, গ্রাম্য কুক্কুট, পেঁয়াজ ও গাঁজর এই সকল বুদ্ধিপূর্ব্বক ইচ্ছা করিয়া খাইলে দ্বিজাতিরা পতিত হন।

মনু প্রভৃতি স্মৃতি-শাস্ত্রকারগণ বৈধ ও অবৈধ মাংস নির্দ্দেশ করিয়া পরিশেষে সর্ব্বপ্রকার মাংস-ভক্ষণ হইতে বিরত হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাম্।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্ব্বো মাংসস্য ভক্ষণাৎ॥

মনু ৫ অঃ ৪৯ শ্লোক।

শুক্র-শোণিত দ্বারা মাংসের উৎপত্তি হয়, অতএব ইহা ঘৃণিত এবং বধ-বন্ধন নিষ্ঠুর হৃদয়ের কর্ম্ম; ইহা নিশ্চয় করিয়া সাধুরা বিহিত মাংসেরও ভোজন হইতে নিবৃত্ত হয়েন, অবৈধ মাংসের কথা আর কি বলিব?

প্রকৃত পক্ষে আহার বিষয় আর্য্যগণের এত বাঁধাবাঁধি নিয়ম কুসংস্কার-জাত নহে; এই সকল নিয়ম আধ্যাত্মিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা অধ্যাত্ম-রাজ্যের অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন; কোন্ দ্রব্য আহার করিলে অধ্যাত্মশক্তি নষ্ট হয়—তাহা তাঁহারা উত্তম-রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞানসম্মত; যাহা স্বাস্থ্যপ্রদ অথচ ধর্ম্মশক্তির বৃদ্ধি-কারক, তাহাই তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে দেহখানি বিশুদ্ধ ইস্পাত-নির্ম্মিত অস্ত্রের ন্যায় পরিষ্কার নির্ম্মল অথচ দৃঢ় ও কষ্ট-সহিষ্ণু, তাহাই সাধনার উপযুক্ত যন্ত্র। এই দেহখানিকে পরিষ্কৃত করিয়া সাধনোপযোগী যন্ত্রে পরিণত করিতে হইলে, ইহার উপাদানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অন্নের দ্বারা আমাদের দেহ প্রতিনিয়ত গঠিত হইতেছে। অদ্ ধাতুর অর্থ ভক্ষণ

করা। আমরা যাহা যাহা কিছু আহার করি, তাহাই অন্ন; এজন্য আমাদের স্থূল দেহটাকে অন্নময়কোষ বলে। যাহার শরীরের যেরূপ উপাদান, তাহার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-বৃত্তিগুলিও তদনুরূপ হইবে। অন্ন কারণ, শরীর কার্য্য ; এই দেহ অন্নেরই রূপান্তর মাত্র। অন্নের অনুরূপ শরীরের শৌর্য্য বীর্য্যরূপ-লাবণ্যাদি জন্মিয়া থাকে এবং মানসিক প্রবৃত্তিও আহারের সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া যায়। সাত্ত্বিক আহার করিলে সাত্ত্বিক সৌম্যপ্রকৃতি হয়, উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য আহার করিলে স্বভাব উগ্র উদ্ধত হয়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

ভগবান মনু বলিয়াছেন যে, যত প্রকার শৌচ (পবিত্রতা) আছে, তন্মধ্যে অন্নের পবিত্রতাই শ্রেষ্ঠ পবিত্রতা। যে ব্যক্তি অন্নের দ্বারা পবিত্র, তিনি যথার্থ পবিত্র, নচেৎ কেবল স্নান বা মৃত্তিকা দ্বারা গাত্র-মার্জ্জন করিলেই যে পবিত্র হয় তাহা নহে। এজন্য আহার সম্বন্ধে আর্য্যগণ এত সাবধান ছিলেন। দেশভেদ ও অবস্থাদিভেদে খাদ্যাখাদ্যের ব্যতিক্রম অপরিহার্য্য। যে দেশে যাহার জন্ম, তাহার পক্ষে সেই দেশজাত ও তথাকার চিরপ্রচলিত খাদ্য দ্রব্যই হিতকর। বিদেশীয় খাদ্য তাহার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। চা,মদ্য. মাংস, বসা প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অপকারী এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ব্যবহার্য্য শীতল বস্তু, শীতপ্রধান দেশে অপকারী।

কতকগুলি বস্তু সকল সময় অপকারী নহে, কিন্তু সময়-বিশেষে অপকার করে। যথা রাত্রিতে দধিভোজন, প্রতিপদাদি তিথিতে কুষ্মাণ্ডাদি-ভোজন। কতকগুলি বস্তু, অন্য বস্তুর সংযোগে অপকারী, যেমন দুগ্ধ ও মৎস্য, মৎস্য ও ঘৃত ইত্যাদি। আর্য্যগণ এই সকল তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক শাস্ত্রে ইহার বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আজ কাল "কুষ্মাণ্ডে চার্থহানিঃ স্যাৎ" প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড

ভক্ষণ করিলে অর্থহানি হয়,—একথা অনেকেই হাস্যাস্পদ মনে করেন। প্রকৃত পক্ষে আর্য্যগণ তিথি ও সময়-বিশেষে যে সকল বস্তু শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতিজনক, তাহা নিষেধ করিয়া, ভয় দেখাইবার জন্য নানাপ্রকার গুরুতর অনিষ্ট-ফল তাহার সহিত যোজনা করিয়া দিয়াছেন। যেমন কোন শিশুর জ্বর হইলে পিতা পুত্রকে নিমের কাথ খাওয়াইবার জন্য "চিনি দিব, লাড়ু দিব" বলিয়া প্রলোভন-বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন; পুত্র পিতার বাক্যে নিম্বের ক্বাথ খায়, কিন্তু পিতা যে বস্তু দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা পায় না। পিতার উদ্দেশ্য জ্বর আরোগ্য হওয়া, চিনি লাড়ু দেওয়া নহে, শিশু তাহা বুঝিতে পারে না। ঋষিগণ বৈজ্ঞানিক ভাবে অপকারিতা বুঝাইলে, কি জানি আমরা সামান্য অনিষ্ট হইবে মনে করিয়া, তাঁহাদের উপদেশ অগ্রাহ্য করি, ইহা ভাবিয়াই বোধ হয়, "রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ"—কার্য্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উৎপাদনের জন্য নানাপ্রকার অনিষ্ট-বর্ণনা করিয়াছেন; ইহারই নাম অর্থবাদ। তিথির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৈহিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, ইহা অনেকেই পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও একাদশীতে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। অন্যান্য তিথির সামান্য পরিবর্ত্তন আমাদের লক্ষ্যে আসে না বটে, কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ তাহা সমস্ত বুঝিতে পারিতেন। সুতরাং কোন্ তিথিতে ও কোন্ সময়ে কোন্ বস্তু ব্যবহার করা অকল্যাণকর, তাহা তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ঋষিদিগের প্রচারিত সমস্ত সত্যই একে একে পাশ্চাত্য মনীষিগণ উপলব্ধি করিতেছেন। কালে তিথ্যাদির বিধি-নিষেধের বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি যে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। যত প্রকার ইন্দ্রিয়ের কার্য্য আছে তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা রসনেন্দ্রিয়ের কার্য্য, মানুষের দৈহিক ও মানসিক উন্নতির পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া আহার সম্বন্ধে আর্য্যগণ সমস্ত

প্রকার তথ্য আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

আহারের সময় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

যাম-মধ্যে ন ভোক্তব্যং ত্রিয়ামন্তু ন লঙ্ঘয়েৎ।
যামমধ্যে রসস্তিষ্ঠেৎত্রিযামে তু রসক্ষয়ঃ॥

এক প্রহরের মধ্যে আহার করিলে শরীরে রসের ভাগ বৃদ্ধি হয়। আর তৃতীয় প্রহর অন্তে আহার করিলে রসক্ষয় হয়। উভয়ই অস্বাস্থ্যের কারণ।

মুনিভির্দ্বিরশনং প্রোক্তং বিপ্রাণাং মর্ত্ত্যবাসিনাং নিত্যং।
অহনি চ তথা তমস্বিন্যাং সার্দ্ধপ্রহরযামান্তঃ।
(ছন্দোগ পরিশিষ্ট)

ঋষিগণ পৃথিবীস্থ ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে প্রত্যহই দিনের মধ্যে দুইবার ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দিবসে আড়াই প্রহরের মধ্যে একবার এবং রাত্রিতে দেড় প্রহরের মধ্যে আর একবার আহার করিবে।

এক সূর্য্যে দুইবার আহার নিষেধ যথা—

দিবাপুনর্নভুঞ্জীতান্যত্র ফল মূলেভ্যঃ। (আপস্তম্ব)

ফলমূলাদি লঘু (হালকা) আহার ভিন্ন দিবসে পুনরায় খাইবে না।

গৃহস্থের রাত্রিভোজন অবশ্য কর্ত্তব্য ; বৈদ্যশাস্ত্রে আছে—

রাত্রাবভোজনং যস্য ক্ষীয়স্তে তস্য ধাতবঃ।

যাঁহারা রাত্রিতে আহার করেন না, তাঁহাদের মাংসাদি সপ্ত ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

স্মৃতি-শাস্ত্রে আছে—মানবগণের দিবা ও রাত্রি এই দুই সময়েই আহার-কার্য্য বেদের অনুমোদিত। আজ কাল ঋষিদিগের এই নিয়ম

শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বড় একটা কেহ পালন করিতে চাহেন না। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, আমাদের আহারের সংযমই সকল অনিষ্টের মূল। কিন্তু যাঁহারা এই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অন্যজাতির বিধানের অনুকরণে ঘণ্টায় ঘণ্টায় আহার করিতেছেন, তাঁহারা যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অপেক্ষা বেশী স্বাস্থ্য ভোগ করিতেছেন, এমত বোধ হয় না। পরিপাকযন্ত্রের বিকলতা হইতে প্রায়শঃ ভুগিতে দেখা যায়। পেটের অসুখ এখন সাধারণ রোগ হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জন লোক পাকযন্ত্রের পীড়ায় আক্রান্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শিক্ষিত সমাজ, আহার সম্বন্ধে সংযত হইতে নেহাৎ নারাজ। তাঁহাদিগের মতে আর্য্যদিগের পান-ভোজন সম্বন্ধীয় যাবতীয় নিয়মাবলী কুসংস্কারাপন্ন। এই বিশ্বাসে তাঁহারা আর্য্যদিগের আহারের কাল-দেশ-পাত্র-পরিমাণ-বিচার পরিত্যাগ করিয়াছেন। অধিকাংশ লোকই এখন 'যা পান তাই খান'—এখন আর মেধ্য-অমেধ্য, খাদ্য-অখাদ্য কেহ বিচার করেন না। বাস্তবিক আমাদের শাস্ত্রকারগণের বহুমূল্য উপদেশের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া যে যথেচ্ছাচারের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি, ইহাতে আমরা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছি। আর্য্য আচার ও আর্য্য আহার-বিহার পরিত্যাগ করিয়া নানা প্রকার আধিব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। উৎকট ব্যাধিসমূহ এখন আমাদের নিত্যসহচর। এ ভাবে আর কিছুকাল চলিলে, আর্য্য প্রকৃতি সমূলে উৎপাটিত হইবে। বস্তুতঃ আহার সম্বন্ধে আচার-বিচার অতি কল্যাণকর, সে নিয়মগুলি লঙ্ঘন করিয়া আমরা আমাদের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করিতেছি।

আর্য্যগণের নিয়মগুলির সারবত্তা একে একে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। এতকাল পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের পানীয় জল

সম্বন্ধে কতই মতভেদ ছিল! কেহ বলিতেন, আহারের সময় মোটেই জল পান করা উচিত নহে। এই সম্বন্ধে কতই বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছে। এখন স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আহারের সঙ্গে সঙ্গে বার বার জল পান করা আবশ্যক।

আর্য্যগণ বহু পূর্ব্বেই বলিয়াগিয়াছেন—

দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈর্জলৈনৈকং প্রপূরয়েৎ।
মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ॥

ভক্ষ্য বস্তুর দ্বারা উদরের অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করিবে, জল দ্বারা একভাগ পূর্ণ করিবে এবং বায়ুসঞ্চারের জন্য চতুর্থ ভাগ শূন্য রাখিবে।

অত্যম্বু-পানান্ন বিপচ্যতেহন্নং, অনম্বুপানাচ্চ স এব দোষঃ।
তস্মান্নরো বহ্নি-বিবর্দ্ধনায় মুহু র্মুহুর্বারি পিবেদভূরি।

(ভাবপ্রকাশ)

অত্যন্ত জল পান করিলে, বা একেবারে জলপান না করিলে, অন্ন-পরিপাক হয় না; এইজন্য পাচকাগ্নির বৃদ্ধির নিমিত্ত বার বার জল পান করিবে।

আদৌ বারি হরেৎ পিত্তং মধ্যে বারি কফাপহং।
অন্তে বারি পচেদন্নং সর্ব্বং বার্য্যমৃতোপমং॥

আহারের প্রথম ভাগে জলপান করিলে পিত্ত, মধ্য ভাগে কফ নষ্ট হয় এবং শেষ ভাগে জলপান করিলে পরিপাক হয়, এজন্য ত্রিবিধ প্রকার জলপানই অমৃততুল্য। নিত্য আহারের সময় আমরাও যথাশাস্ত্র কুলপ্রথানুসারে ভূরাদি পঞ্চদেবতা অথবা নাগ-কূর্ম্মাদি নববায়ুকে ভূমিতে অন্ন নিবেদন করিয়া, অন্ন-ব্যঞ্জন সমস্ত ইষ্টদেবতাকে উৎসর্গ করিয়া এক গণ্ডূষ জল "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" (হে জল তুমি অমৃত স্বরূপ হইয়া আমার ভুক্ত অন্নের নীচে আস্তরণ রূপে থাক) মন্ত্রে

পান করি। আহার শেষে পুনরায় এই মন্ত্রে এক গণ্ডূষ জল পান করিয়া পাত্র ত্যাগ করি যথা "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা"। হে অমৃতসদৃশ জল, তুমি আমার ভক্ষ্য বস্তুর উপরে আবরণ-স্বরূপ হইয়া থাক।

অতিভোজন সম্বন্ধে ভগবান্ মনু বলেন—

অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনং।
অপুণ্যং লোক-বিদ্বিষ্টং তস্মাত্তং পরিবর্জয়েৎ॥ মনু ২। ৫৭

অতিভোজন করিলে শরীর রোগে আক্রান্ত হয়, পরমায়ুর হ্রাস হয় এবং স্বর্গ-সাধন যাগাদি যাবতীয় ধর্ম্ম-কার্য্যে অনধিকারী হইতে হয়, এজন্য ইহা অপুণ্য অর্থাৎ নরকের কারণ। লোকেও ঔদরিক বলিয়া নিন্দা করে, অতএব অতিভোজন অবশ্য পরিত্যাজ্য।

মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে মিতাহারী লোকের এইরূপ ছয়টী গুণ বর্ণিত আছে। মিতাহারীর রোগ হয় না, আয়ু বৃদ্ধি হয়, বল পূর্ণ থাকে, সুখে থাকে, সন্তানে আলস্য-দোষ ঘটে না এবং লোকে ঔদরিক বলিয়া গালি দেয় না।

স্বয়ং ভগবান্ গীতায় নিয়তাহার ও যুক্তাহার-বিহারের উপদেশ দিয়াছেন। চতুর্থাধ্যায়ে ২৯ শ্লোক "নিয়তাহার" শব্দের শাঙ্করভাষ্যে এইরূপ ব্যাখ্যা আছে -

"নিয়তঃ পরিমিতঃ আহারো যেষাং"

ষষ্ঠাধ্যায়ে ষোড়শ ও সপ্তদশ শ্লোকে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি অতিরিক্তাহারী তাহার যোগ হইতে পারে না, আর যে অতিশয় অল্প আহার করে, তাহারও যোগ অসম্ভব। হে অর্জ্জুন! অতিশয় নিদ্রাশীল, আর একবারে জাগরণশীলেরও যোগ আয়ত্ত হয় না। কিন্তু যিনি পরিমিত-নিদ্র ব্যক্তি, তাঁহারই সর্ব্বসংসারদুঃখের বিনাশক যোগ-ক্রিয়া সাধিত হইতে পারে।

বাস্তবিক যাঁহারা যুক্তাহার-বিহার-সম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁহারাই প্রকৃত মনুষ্য এবং তাঁহারাই মনুষ্যোচিত ধর্ম্মে অলঙ্কৃত। যা' তা' কতকগুলি উদরসাৎ করিলেই যে লোক নীরোগ ও বলিষ্ঠ হয়, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সংস্কার।

"আমিষ নিরামিষ" আহার নিয়া বহুকাল একটী তর্ক চলিয়া আসিতেছে। আর্য্যগণ নিরামিষ আহার—সাত্ত্বিক আহার বলিয়া, তৎপ্রতি পক্ষপাতী ছিলেন। যাঁহারা মনে করেন যে, সাত্ত্বিক নিরামিষ আহার আমাদের শৌর্য্য-বীর্য্যের অন্তরায়, তাঁহারা একবার কলির ভীম রামমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করুন। রামমূর্ত্তির আহার সম্বন্ধে হিন্দু-পত্রিকায় ১৩১৯ সালের আশ্বিন-সংখ্যায় ২৩৪ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ বি, এল্ মহাশয় লিখিয়াছেন

"তিনি (রামমূর্ত্তি) প্রাতে ৮ টার সময় বাদাম-পেস্তার সরবৎ, এক ঘণ্টা পরে ছটাক খানেক টাট্‌কা মাখন, বেলা ১টার সময় কিছু ভাত, ডাল, তরকারী ও শাকসব্জি ও জল সর্ব্বশুদ্ধ এক পোয়ার অধিক নহে, অপরাহ্ণ চারিটার সময় প্রাতঃকালের ন্যায় সরবৎ, অতিরিক্তের মধ্যে একটু পায়স, তারপর রাত্রে সার্কাস-ভঙ্গের পর সর্ব্বশুদ্ধ পোয়াটেক ওজনের ডাল ভাত, তরকারী আহার করেন।"

সম্প্রতি দুইজন জর্ম্মণ-দেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, বিশেষরূপ পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে নিরামিষ-ভোজনই মনুষ্যের দীর্ঘায়ুলাভ ও স্বাস্থ্য-রক্ষার অমোঘ উপায়।

কিন্তু যে সকল ব্যক্তি সাত্ত্বিকপ্রকৃতিসম্পন্ন নহেন, তাঁহাদের পক্ষে ঋষিগণ, ঝটিতি রাজসিক ও তামসিক মৎস্যমাংস পরিত্যাগের ব্যবস্থা দেন নাই। তাঁহারা শাস্ত্রীয় আদেশ অনুসারে "শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ" ক্রমে উপরত হইবেন। তাড়াতাড়ি ছাড়িলে, ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত

হইবার সম্ভাবনা। ঋষিগণ আমাদের ন্যায় রাজসিক তামসিক প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কি সুন্দর উপায় সকল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে তাঁহাদের অসীম জ্ঞানবত্তায় স্তম্ভিত হইতে হয়। প্রথমে প্রতি মাসে চারি রবিবারে ও পঞ্চপর্ব্বে (অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও রবিসংক্রান্তি) মৎস্য-মাংস নিষেধ করিয়াছেন, পরে কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসে আমিষ-ভক্ষণ ত্যাগ করিবার বিধি দিয়াছেন। যাঁহারা সম্পূর্ণ মাস নিরামিষ ভোজন করিতে অশক্ত, তাঁহাদের নিমিত্ত অনুকল্প ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাঁহারা সমস্তকার্ত্তিক মাস আমিষ-ত্যাগ করিতে পারেন না, তাঁহারা শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী হইতে রাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই পাঁচদিন নিরামিষ আহার করিলেই সমস্ত মাস নিরামিষ আহারের ফল পাইবেন।

একাদশ্যাদিষু তথা তাসু পঞ্চসু রাত্রিষু।
দিনে দিনে চ স্নাতব্যং শীতলাম্বু নদীষু চ।
বর্জিতব্যা তথা হিংসা মাংস-ভক্ষণমেব চ।

এইরূপে ধীরে ধীরে (শনৈঃ শনৈঃ) রাজসিক তামসিক আহার ছাড়িয়া সাত্ত্বিক আহার অভ্যাস করিতে হইবে।

যাহারা একান্ত মাংস-পরিত্যাগে অসমর্থ, যাহাতে অধর্ম্ম হিংসাপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন না করে, তজ্জন্য তাহাদের পক্ষে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ পশুর মাংস "বৈধ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার ঐসব পশুকেও নিজের উদরপূর্ত্তির জন্য বধ করিতে নিষেধ করিয়া, কেবল দেবোদ্দেশে ও পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে বধ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—যে মনুষ্য, দেবলোক ও পিতৃলোককে বিধিমতে মাংস না দিয়া ভোজন করে, সে মৃত হইয়া একবিংশতি জন্ম পশু-যোনি প্রাপ্ত হয়।

মন্দের ভাল বলিয়া যজ্ঞে দেবতার নিকট পশু "বলি" দিবার বিধান করিয়াছেন। শ্রুতি "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" বলিয়াও পরে ব্যবস্থা দিয়াছেন "তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽ বধঃ"। যে কাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সাত্ত্বিকভাবের উদয় না হয় এবং হিংসা-প্রবৃত্তি সমূলে উৎপাটিত না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত যজ্ঞাদিতে পশুবধ কর্ত্তব্য। তন্ত্রশাস্ত্রও এইভাবে বলিয়াছেন—

অহিংসা পরমো ধর্ম্মো নাস্ত্যহিংসা-পরং সুখং।
বিধিনা যা ভবেৎ হিংসা সাত্ত্বহিংসা প্রকীর্ত্তিতা॥
ভূত-হিংসা ন কর্ত্তব্যা পশুহিংসা বিশেষতঃ।
বলিদানং বিনা দেবি হিংসাং সর্ব্বত্র বর্জয়েৎ॥

যাঁহারা হিংসা না করিয়া পারেন না, তাঁহারা দেবোদ্দেশে বলিদান ভিন্ন অন্য সময়ে হিংসা করিবেন না। প্রাচীনগণ কখনও "বৃথা মাংস" ভক্ষণ করিতেন না। এক্ষণে "বলি দেওয়া" দোষের হইয়া দাঁড়াইয়াছে বটে, কিন্তু নিজ উদর-পূর্ত্তির জন্য পশু-হিংসাতে কেহ কোন দোষ মনে করেন না। শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, দেবোদ্দেশে বলি দিলে হিংসা-বৃত্তি দেবতার অর্থে নিয়োজিত হইলে, ক্রমে ভক্তিবৃদ্ধি হইতে থাকিবে সুতরাং বিরুদ্ধ হিংসাবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। অবৈধ হিংসা অপেক্ষা বৈধ হিংসা অপেক্ষাকৃত মঙ্গলজনক বলিয়া "অহিংসা" নামে অভিহিত হইয়াছে। বাস্তবিক বৈধ হিংসাও হিংসা। কিন্তু যাহাতে লোকে অবৈধ বৃথা হিংসা পরিত্যাগ করিয়া বৈধ হিংসাতে মাত্র প্রবৃত্ত হয়, এজন্য ঐরূপ বাক্য-প্রয়োগ করিয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ ঐ অধর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিয়া বিধিনিষেধ দ্বারা বেষ্টিত করিয়াছেন। ইষ্টদেবের প্রতি ভক্তি-প্রণোদিত হইয়া বলি দিতে দিতে ক্রমে হিংসাপ্রবৃত্তি সমূলে উৎ-পাটিত হইবে। সাধক যখন বলি দেন, তখন হিংসা-প্রণোদিত হইয়া

দেন না; ভক্তি প্রণোদিত হইয়াই দিয়া থাকেন, কিন্তু চিত্তে রাজসিক ও তামসিক ভাব প্রবল থাকা নিবন্ধন মাংসাহার একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন না; কাজেই ঋষিগণ এইভাবে ঐরূপ প্রবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে আনয়ন করিয়াছেন। যাঁহারা সাত্ত্বিকবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁহাদের পক্ষে বলিদানের ব্যবস্থা নাই। তাঁহারা নিরামিষ উপহার দিবেন।

সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ

সাত্ত্বিকী পূজাতে জপ-যজ্ঞ ও নিরামিষ নৈবেদ্য, আর রাজসিকী ও ও তামসিকী পূজাতে বলির ব্যবস্থা। "রাজসো বলিরাখ্যাতো মাংস-শোণিত সংযুতঃ।"

অনেকে মনে করেন, বলি না দিলেই সত্ত্বগুণাবলম্বী হইলেন, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। যাঁহার চিত্তে হিংসাবৃত্তি ও মাংসাহারের প্রবৃত্তি পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত, তিনি বলি না দিলেও সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক নহেন। তাহার পক্ষে বলি দেওয়াই বিধি, বরং বলি না দিলে পূজার অঙ্গবৈগুণ্য ঘটিবে। সাত্ত্বিকপ্রকৃতির লোক না হইলে সাত্ত্বিকী পূজা হয় না। ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া কেবল মাত্র কর্ত্তব্য বোধে যথাবিধি যে পূজা বা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে সাত্ত্বিকী পূজা বা সাত্ত্বিক যজ্ঞ কহে। ফল-কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কিম্বা যশোলিপ্সা দ্বারা চালিত হইয়া যে পূজা ও যজ্ঞ করা হয়, তাহাকে রাজসী পূজা বা যজ্ঞ বলে। আর যে পূজা বা যজ্ঞ, বিধিহীন, অন্নদান-বিহীন, মন্ত্রবিহীন ও উপযুক্ত দক্ষিণা-বিহীন এবং ভক্তি শ্রদ্ধা-বিরহিত, তাহাকে তামসী পূজা বা তামস যজ্ঞ বলে। আমরা কে কোন্ প্রকার পূজার অধিকারী, তাহা নিজ নিজ অন্তঃ-করণের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। যাঁহার অন্তঃকরণ

নির্ম্মল এবং অহিংসা, অক্রোধ, সরলতা, সর্ব্বভূতে দয়া, সত্য, ক্ষমা প্রভৃতি গুণরাশি দ্বারা ভূষিত হইয়াছে, তিনিই সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক।

আমাদিগের সাত্ত্বিকপ্রকৃতিসম্পন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রে অনেক প্রকার উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে—তন্মধ্যে আহারশুদ্ধি অর্থাৎ সাত্ত্বিক পান আহারের প্রতিবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাই প্রকৃষ্ট। শাস্ত্রে যেরূপ সাত্ত্বিক আহারের ব্যবস্থা, সেই প্রকার আবার আচারবান্ হইয়া পবিত্র ভাবে ভোজন করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। আহার-শুদ্ধি হইলে তবে সত্ত্বশুদ্ধি হইবে। "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" ইহা উপনিষদের উপদেশ। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন -

অচারাল্লভতে হ্যায়ু রাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণং॥

৪র্থ অধ্যায় ১৫৫ শ্লোক।

সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তি আয়ু লাভ করেন এবং অভীপ্সিত পুত্র-পৌত্রাদি প্রজা ও অক্ষয় ধন প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার শরীরে অলক্ষণ-সূচক কোন চিহ্ন থাকিলেও তাহা নষ্ট হয়।

আচারঃ পরমো ধর্ম্ম শ্রুত্যুক্ত স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদাযুক্তো নিত্যঃ স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ॥

মনু ১।১০৮।

আচার যে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ইহা শ্রুতি স্মৃতি উভয়েই প্রতিপন্ন আছে অতএব আত্মহিতাভিলাষী ব্রাহ্মণ শ্রুতি স্মৃতি বিহিত আচারের অনুষ্ঠানে সতত যত্নবান্ থাকিবেন॥ স্থানান্তরে আছে—

আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ।

রাজোগুণ ও তমোগুণ-সম্ভূত চাঞ্চল্য ও আলস্যাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া, সত্ত্ব রূপ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য শাস্ত্র

যে সকল বিধি দিয়াছেন, তাহারই নাম শাস্ত্রাচার বা সদাচার। এই সদাচার মানুষের ক্রিয়াভেদে অনেক প্রকার বর্ণিত আছে। আহার সম্বন্ধে মহর্ষিচরকের উপদেশ এই:—

উষ্ণং স্নিগ্ধং মাত্রাবজ্জীর্ণে বীর্য্যাবিরুদ্ধং, ইষ্ট-দেশে ইষ্ট-সর্ব্বোপকরণং নাতিদ্রুতং নাতিবিলম্বিতং ন জল্পন্ ন হসংস্তন্মনা ভূঞ্জীত আত্মানমভি-সমীক্ষ্য সম্যক্। (বিমান, ১ম অঃ)

পূর্ব্বভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইলে, পরিমিতভাবে এবং অবিরুদ্ধ ঈষদুষ্ণ স্নিগ্ধ (ঘৃতাদিযুক্ত) অন্ন, পবিত্র (গোময়াদিলিপ্ত) স্থানে মনঃ-প্রীতিকর পরিষ্কৃত ব্যঞ্জনাদি-উপকরণযুক্ত, অতিদ্রুতও নহে, অতিশয় ধীরে ধীরেও নহে, বৃথা গল্প ও হাস্য-পরিহাস ত্যাগ করিয়া, তদ্‌গত চিত্তে একমনে, নিজের শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আহার করিবে।

অতিদ্রুত ও অতিধীরে ভোজন উভয়ই দোষাবহ। অতিধীর ভোজন সম্বন্ধে চরকে এই রূপ লিখিত আছে -

অতিবিলম্বিতং হি ভূঞ্জানো ন তৃপ্তিমধিগচ্ছতি বহু ভুঙ্‌ক্তে শীতলী ভবতিচাহারজাতং বিষমপাকঞ্চ ভবতি তস্মান্নাতিবিলম্বিতমশ্নীয়াৎ॥

(বিমান ১ অঃ)

অতিশয় ধীরে ধীরে আহার করিবে না। যাহারা অতি ধীরে আহার করে, তাহরা আহারে পরিতৃপ্ত হয় না, কেবল খাইতেই থাকে। আহারের মাত্রা বাড়িয়া যায়, আহার্য্য বস্তু শীতল হইয়া যায় এবং পাচকাগ্নি বৈষম্য ভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব অতিধীরে আহার করিবে না।

গোময়াদি-লিপ্ত স্থানের নাম শুনিয়া কেহ চমকিত হইবেন না। হিন্দুর চক্ষে গোময় অতি পবিত্র, তাঁহারা আবহমান কাল হইতে গোময় ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। গোময়ের নানা প্রকার গুণ ধর্ম্মশাস্ত্রে ও চিকিৎসাশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। হিন্দুরা যে কেবল গোময়

দ্বারা স্থান পরিষ্কার করেন এমত নহে ; নানা ধর্ম্ম-ক্রিয়ায় গোময় দ্বারা পঞ্চগব্য (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র) পান করিয়া পবিত্র হন। গোময় দুর্গন্ধ নিবারণ করে, নানা প্রকার রোগের বীজাণু নষ্ট করে, এবং চিত্তে সাত্ত্বিকভাব আনিয়া দেয়। ইহা কাল্পনিক কথা নহে। পাশ্চাত্য-জগতেও এই সকল সত্যের আংশিক উপলব্ধি ঘটিতেছে। সম্প্রতি ডাক্তারী পত্র লান্সেটে প্রকাশ—মাদ্রাজে আর পূর্ব্ববঙ্গে যে প্লেগের প্রভাব এত অল্প, গোময় দ্বারা তদ্দেশীয় গৃহস্থের গৃহ পরিষ্কার করাই তাহার একমাত্র কারণ। পূর্ব্ববঙ্গে কুলবধূরা প্রত্যুষে জাগ্রত হইয়া সমস্ত প্রাঙ্গণে ও অন্যান্য স্থানে গোবর-ছড়া দিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, ইংরাজি-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে এ অভ্যাস পরিত্যাগ করিতেছেন।

স্নান না করিয়া আহার করিতে শাস্ত্রকারগণ নিষেধ করিয়াছেন। স্নান না করিলে পাচকাগ্নির বৃদ্ধি হয় না এবং তৃপ্তিলাভ হয় না।

অস্নাত্বাশী মলং ভুঙ্‌ক্তে অজপী পূয়-শোণিতং ;

সুস্থ শরীরে থাকিয়া স্নান না করিয়া যে খায়, সে বিষ্ঠা খায় এবং সন্ধ্যাহ্নিক না করিয়া যে খায়, সে পূযরক্ত খায়।

অবশ্য যাহারা আতুর, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

ন স্নানমাচরেদ্ভুঙ্‌ক্ত্বা নাতুরো ন মহানিশি।
ন বাসোভিঃ সহাজস্রং নাবিজ্ঞাতে-জলাশয়ে॥
(মনু ৪র্থ অঃ ১২৯)

ভোজন করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে স্নান করিবে না, পীড়িত হইলে স্নান করিবে না, মহানিশায় অর্থাৎ রাত্রি ৯ টার পর ৩টার মধ্যে কিংবা বহুবস্ত্র পরিধান করিয়া, অথবা বহুবার স্নান করিবে না এবং অপরিচিত জলাশয়ে স্নান করিবে না।

স্নান অতি পবিত্রতাজনক এবং স্বাস্থ্যপ্রদ; এজন্য ঋষিগণ "স্নান অবশ্য কর্ত্তব্য" বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। স্নান আত্মার ও শরীরের কল্যাণজনক। স্নান, আহারের পূর্ব্বে একান্ত আবশ্যক; কারণ আহারের সময় যাহাতে সাত্ত্বিক ভাব পূর্ণমাত্রায় প্রবল থাকে, তদনুরূপ আচার অবলম্বন করিতে হইবে—

স্নানং পবিত্রমায়ুষ্যং ক্লমস্বেদমলাপহং,
শরীরবলসন্ধানং কেশ্যমোজস্করং পরং॥

স্নান পবিত্রতাজনক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, শ্রমনাশক, স্বেদনিবারক, মলাপহারক, কেশবর্দ্ধক, ও পরম তেজস্কর।

যাহারা অশক্ত ও আতুর, তাহাদের পক্ষে আর এক প্রকার স্নানের অনুকল্প আছে যথা—

অশিরস্কং ভবেৎ স্নানং স্নানাশক্তৌ তু কর্ম্মিণাং।
আর্দ্রেণ বাসসা বাপি মার্জ্জনং দৈহিকং বিদুঃ॥

কর্ম্মী ব্যক্তি স্নানে অশক্ত হইলে মস্তক না ভিজাইয়া আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা গা মুছিয়া স্নানের অনুকল্প করিতে পারেন।

আহার সম্বন্ধে আরও অনেক নিয়ম আছে, তন্মধ্যে হাত পা ও মুখ প্রক্ষালন করা একটী। ইহাতে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। যথা—

পঞ্চার্দ্রো ভোজনং কুর্য্যাদ্ ভূমৌ পাত্রং নিধায় চ।

কূর্ম্ম ১৮

পঞ্চ অঙ্গ অর্থাৎ হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মুখ ধৌত করিয়া তবে আহার করিবে। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন—

আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জীত, নার্দ্রপাদস্তু সংবিশেৎ।
আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জানো দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ॥

(মনু ৪অঃ ৭৬ শ্লোক)

আদ্র´পদে ভোজন করিবে, কিন্তু শয়ন করিবে না। আদ্র´ পদে ভোজন করিলে, দীর্ঘ পরমায়ু প্রাপ্ত হয়।

আ'জ কা'ল ক্বচিৎ মুখ ও হাত ধুইলেও পা ধুইতে অনেকেই নারাজ। পদদেশ মোজা দ্বারা আবৃত থাকে, তাহা খুলিয়া পদ প্রক্ষালন করা কুসংস্কারের পরিচায়ক হইয়া উঠিয়াছে। আহারের পূর্ব্বে দূরে থাক, মল মূত্র-ত্যাগের পরও আর কেহ বড় একটা পদ ধৌত করেন না। বিগত ১৯১৪ সালের ৮ মার্চ´ তারিখের বঙ্গবাসী নামক পত্রিকায় লিখিত ছিল—

"পা-ধোয়া। কোন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন—দিনে ভিতর যতবার পারা যায়—পা-ধোয়া ভাল; শুইবার পূর্ব্বেও গরম জলে পা-ধোয়া কর্ত্তব্য। অতিরিক্ত পরিমাণে পা-ধোয়া যে ভাল, এদেশে আচারনিষ্ঠ হিন্দুর নিকট এ কথাটা নূতন নহে। কিন্তু কালধর্ম্মে অনেক বাবু হিন্দুই ইদানীং জুতা মোজা পায়ে দিয়া পায়খানায় পর্য্যন্ত গিয়া থাকেন। এ সকল কদাচারের ফল ফলিতেছে – ফলিবেইত!"

হস্ত-পদাদি ধৌত করার নিয়ম মুসলমান্ সমাজেও বহুল ভাবে প্রচলিত আছে। আমরাই বিদেশীয়দিগের অনুকরণে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত আমাদের নিজের আচার হারাইয়া কিম্ভূত কিমাকার পদার্থে পরিণত হইতেছি। এমন কি মল-মূত্র-ত্যাগ সম্বন্ধেও আমরা শৌচাচার ত্যাগ করিতেছি। এখন মূত্র-ত্যাগের পর জল-শৌচ অত্যন্ত হাস্যকর বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা এখনও এই শৌচ ত্যাগ করেন নাই, তাঁহারাও ভয়ে ভয়ে অন্যের অলক্ষিত ভাবে জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। পাছে কেহ দেখিয়া অসভ্য বর্ব্বর মনে করে, এই ভয়ে আড়ষ্ট। ইহা আমাদের অতি দুরদৃষ্ট।

হিন্দুর মতে "ধর্ম্ম" কোন আগন্তুক পদার্থ নহে। ধর্ম্ম, জীবাত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ নিজস্ব বস্তু। বিহিত আচার ও সাধনা দ্বারা ইহার বিকাশ হইয়া থাকে। হিন্দুর ধর্ম্মের চরমোন্নতির ফল "সোহহং জ্ঞান" বা আত্ম-দর্শন যাহাকে ভগবান্ মনু "বিদ্যা" নামে পরম ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাঁহারা বলেন—ধর্ম্মের সহিত আহারের কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। অন্ততঃ তাঁহারা, আর্য্যগণ, ধর্ম্মকে যে ভাবে দেখিতেন, সে ভাবে দেখেন না। তাঁহারা ধর্ম্ম বলিলে কি বুঝেন জানি না। যাঁহারা হিন্দুভাবে অনুপ্রাণিত, তাঁহারা পান-ভোজনের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই—ইহা কখনও বলিতে পারেন না। আর্য্যগণের ধর্ম্ম, ধৃতি ক্ষমা দান বিবেক বৈরাগ্য ভক্তি পভৃতি সত্ত্বগুণ-জনিত অন্তঃকরণের এক একটী অবস্থা বিশেষ। ভগবান্ মনু, প্রধানতঃ দশটী ধর্ম্ম-শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের অন্তঃকরণ, ধর্ম্মের বীজাধার, এবং এই স্থূল দেহটা তাহার ক্ষেত্র-ভূমি। বৃক্ষাদির মূল বীজটী যেমন আঁটির মধ্যে নিহিত থাকে, পরে উপযুক্ত মৃত্তিকায় সংস্থাপিত হইলে পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, আমাদের ধর্ম্মও সেইরূপ অন্তঃকরণ-রূপ আঁটির মধ্যে বীজ-ভাবে অবস্থিতি করে, পরে আমাদের শরীরের সত্ত্বগুণপ্রধান উপাদান সমূহ আকর্ষণ পূর্ব্বক পরিপুষ্ট হয়। যাঁহাদের দেহে সত্ত্বপ্রধান উপাদান নাই এবং অবৈধ খাদ্যাদির দ্বারা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন রাজসিক ও তামসিক উপাদান সঞ্চিত হইতেছে, তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ক্রমে পোষণ অভাবে শুকাইয়া যাইতেছে এবং আশানুরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে না। তাঁহারা এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া, যে জীব-দেহে এই সকল ধর্ম্মের বীজ পরিপুষ্ট হয় নাই সেইরূপ দেহ আশ্রয় করিবেন। খাদ্যখাদ্যের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের অতি গুরুতর সম্বন্ধ। যে জাতীয় খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুকূল পদার্থ

একেবারেই নাই, কি অতি সামান্য মাত্রায় আছে, আর অধর্ম্ম-প্রবৃত্তির পোষক পদার্থ পূর্ণমাত্রায় আছে, সেই দ্রব্য ভোজন করিলে, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিগুলি প্রথম অঙ্কুর মাত্রেই মরিয়া যাইবে, অথবা অতি ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। বস্তুর গুণ-বিচারপূর্ব্বক সাত্ত্বিকপদার্থবিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করাই কল্যাণকামী মানবগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

ঋষিগণ অধ্যাত্মশাস্ত্রের গুরু ছিলেন। তাঁহারা যে সকল আচার ও খাদ্য, ধর্ম্মশক্তির প্রতিকূল, তাহা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাত্ম-রাজ্যে উন্নীত হইতে হইলে তাঁহাদের বিধি-নিষেধ সম্যক্ প্রকারে পালন করিতে হইবে এবং তাঁহারা যে পথে গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিতে হইবে।

অবিহিত আহার দ্বারা জাতি নষ্ট হয়, এই কথাটী বহুকাল হইতে হিন্দু-সমাজে চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য এখন অনেকে ব্যঙ্গোক্তি করিয়া বলিয়া থাকেন যে "জাতি আর যাইবে কোথায়?" যাহার যে জাতিগত মানবোচিত স্বধর্ম্ম (ধৃতি ক্ষমা আদি) তাহা যে সকল পান আহার দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হয় অথবা ক্ষীণাবস্থাপন্ন হয়, ঐরূপ পান আহার দ্বারা তাহার "জাতি" যায় বা জাতিগত ধর্ম্ম নষ্ট হয়, ইহাই ঐ কথার তাৎপর্য্য। ধর্ম্ম-শক্তির প্রভাবেই মানুষ "মানুষ"। ধর্ম্মশক্তির অভাব হইলে মানুষ ও ইতর জন্তুর মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না; ধর্ম্মই মনুষ্যের এই পার্থক্যের কারণ। এই ধর্ম্মই আমাদের মঙ্গলময় পরম বস্তু। বৈশেষিক দর্শনকার বলেন "যতো ঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ" যাহা হইতে জীবের যাবতীয় লৌকিক মঙ্গল সাধিত হয় এবং মুক্তি লাভ হয় তাহাই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মই আমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যায় এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তি দান করিয়া থাকে। এজন্য আর্য্যগণ যাহাতে এই ধর্ম্ম-শক্তির কিঞ্চিন্মাত্রও অবনতির কারণ দেখিতেন, তাহাই

দূরে পরিহার করিতেন। ইহা তাঁহাদের কুসংস্কার নহে। অবশ্য যাঁহারা ধর্ম্মশক্তির বৃদ্ধি দ্বারা পরম পদার্থ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য নহে। যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মশক্তি (বিদ্যা) লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আর ধর্ম্ম-শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির ভাবনা নাই, কাজেই তাঁহারা বিধি-নিষেধের বাহিরে। যাঁহারা মনুকথিত "বিদ্যা" রূপ ধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করেন নাই এবং অধ্যাত্ম-রাজ্যের নিম্ন স্তরে আছেন, তাঁহাদিগকে যাহাতে ধর্ম্মশক্তির হ্রাস-নিবন্ধন অধঃপতিত হইতে না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর ন্যায় জীবন্মুক্ত পুরুষের খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে কোন বিধি-নিষেধ ছিল না এবং এইরূপ পুরুষের পক্ষে থাকার আবশ্যকতা নাই। তাঁহাদের আচার আমাদের অনুকরণীয় নহে, কারণ তাঁহারা ভিন্ন স্তরের জীব। আর্য্য ঋষিগণ দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন যে, মানব জাতি নিয়ম-বিরহিত হইলে ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া উত্তরোত্তর অবনতির দিকে অগ্রসর হইবে এবং নিরন্তর কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া অসৎ কর্ম্ম করিবে। এরূপ অবস্থায় মানবের ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। একারণ আমাদের ঐহিক ও পারলৌকিক হিতসাধনের জন্য প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং ধর্ম্মশক্তির অনুকূল ব্যবস্থা গুলিকে আচার বা সদাচার নামে অভিহিত করিয়াছেন।

রসনেন্দ্রিয়ের বৃত্তিকে ঈশ্বরাভিমুখী করিতে হইলে নিজের প্রিয় ভোগ্য বস্তু সমস্ত তাঁহাকে অর্পণ করিয়া, তাঁহার প্রসাদস্বরূপ সেই সকল ভোগ করিতে হইবে এবং ঐ সকল দ্রব্য-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ অবলম্বন করিতে হইবে। শাস্ত্র, আহার বিষয়ে যে সকল

আচারের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমাদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের সাহায্যকারী, এজন্য সে গুলিকে মানিয়া চলিতে হইবে। ঋষি কথিত আচার পরিত্যাগ করিলে আত্মার অমঙ্গল হইবে এবং সত্ত্ব-শক্তির বৃদ্ধি না হওয়ায়ও ক্রমে রজস্তমোগুণের বৃদ্ধিনিবন্ধন আমরা বিষয়ে আরও জড়াইয়া পড়িব। সুতরাং উপাসনা রাজ্যে রসনেন্দ্রিয়ের সংযম আবশ্যক। এই ইন্দ্রিয়ের যথেচ্ছাচারিতায় আমাদের যাবতীয় ধর্ম্মশক্তি এক কালে বিনাশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া, আর্য্য ঋষিগণ এ বিষয়ে এত সাবধান ছিলেন। যাহা আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যপ্রদ কিন্তু অন্তঃকরণের অকল্যাণকর, তাহা তাঁহারা দূরে পরিহার করিতেন। কারণ মনুষ্যসমাজকে ব্যাঘ্রাদি জন্তুর ন্যায় পাশব-প্রকৃতি-সম্পন্ন করিয়া তোলা কখনও মঙ্গলময় বিধাতার উদ্দেশ্য নহে। তিনি আমাদিগকে নানা প্রকার দেবোচিত ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা সুশোভিত করিয়াছেন। যাহাতে ঐ সকল বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহাতেই আমাদের কল্যাণ। ঋষিগণ যাহা শারীরিক স্বাস্থ্যপ্রদ অথচ আধ্যাত্মিক ধর্ম্মশক্তির অনুকূল, তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব-লাভের প্রয়াসী, তাঁহাদিগকে কিসে ধর্ম্মের পরিপুষ্টি হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

উপবাস।

উপবাস রসনেন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া চিত্তকে ঈশ্বরাভিমুখী করার আর একটী প্রধান উপায়। উপবাস দ্বারা সত্ত্ব শক্তির বৃদ্ধি ও আহার-বিষয়ে আসক্তির নাশ—উভয় উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়। উপবাস কাহাকে বলে, শাস্ত্র এই প্রকারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা—

উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসো গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ॥

(ভবিষ্যপুরাণ।)

সমস্ত প্রকার পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া এবং সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয় হইতে বিরত থাকিয়া, সাত্ত্বিক গুণের সহিত অবস্থিতি করার নাম উপবাস।

আমরা উপবাস বলিলে অনশন বুঝিয়া থাকি। অনশন দ্বারা ভবিষ্য পুরাণোক্ত উদ্দেশ্য কি প্রকার সিদ্ধ হয়, তাহা বুঝিতে হইবে। হিন্দু-মাত্রেই জানেন যে, আমাদের যাবতীয় ধর্ম্মকার্য্য ও বিবাহাদি সংস্কার অনশনে থাকিয়া করিতে হয়। উপবাসের উদ্দেশ্য সাত্ত্বিক গুণ বৃদ্ধি করা এবং পাপ-স্বরূপ রজস্তমোবৃত্তিসকল হইতে বিরত থাকা।

সত্ত্বগুণ এক প্রকার অলৌকিক সুখস্বরূপ। ঐ গুণ আবির্ভূত হইলে শরীরের মধ্যে একরূপ অলৌকিক সুখময় ভাব অনুভূত হয়। সেই সুখ—বিষয়ভোগজনিত সুখ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সত্ত্বগুণ জড়তাবিহীন; উহার আবির্ভাব-কালে শরীরের সর্ব্ববিধ জড়তা আলস্য প্রভৃতি দূর হয়; শরীরের মধ্যে কেমন এক প্রকার লঘুভাব উপলব্ধি হয়। সত্ত্বগুণ প্রকাশ-স্বরূপ; উহা আবির্ভূত হইলে অভ্যন্তরবর্ত্তী সমস্ত অজ্ঞানরূপ অন্ধকার

নষ্ট হয় এবং কেমন এক প্রকার শান্তিময় সুখময় ভাবের অনুভূতি হয়; তখন ঈর্ষা, অসূয়া বা ক্রোধাদি কোনও প্রকার রাজস ও মোহ অবসাদ আলস্য প্রভৃতি তামস ভাব থাকিতে পারে না। প্রত্যেক মানব-শরীরে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ —এই শক্তিত্রয় বিদ্যমান আছে। ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তিসম্পন্ন এবং সতত ইহাদের মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে। এক বার সত্ত্ব শক্তি, রজঃ ও তমঃ শক্তিকে জয় করিয়া আত্মলাভ করিতেছে; আবার কখনও রজঃশক্তি ও কখনও তমঃশক্তি প্রাধান্য লাভ করিতেছে। আমাদের শরীরাভ্যন্তরে এই দেবাসুর সংগ্রাম নিয়ত চলিতেছে।

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎত্রিভির্গুণৈঃ॥

—গীতা, ১৮ অঃ, ৪০ শ্লোক।

এই পৃথিবীতে, স্বর্গে বা দেবলোকে এমন কোন বস্তুই নাই, যাহা উক্ত প্রকৃতির তিন গুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) হইতে বিমুক্ত ভাবে আছে, অর্থাৎ সকলই ত্রিগুণাত্মক। আমাদের জ্ঞান-শক্তি সত্ত্বগুণ বা সত্ত্বশক্তি হইতে, পরিচালনা-শক্তি রজোগুণ বা রজঃশক্তি হইতে এবং পোষণ-শক্তি তমোগুণ বা তমঃশক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, সত্যনিষ্ঠা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, দম, দয়া, প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম-শক্তি এই সত্ত্ব শক্তি হইতে উদ্ভূত। রজঃশক্তি সকল বিষয়তৃষ্ণা ও বিষয়াসক্তির মূল কারণ; ঐ শক্তি আত্মাকে বিষয়ের নিমিত্ত লালায়িত করে এবং সত্ত্বশক্তির প্রতিকূল ক্রিয়া দ্বারা আত্মাকে বিষয়াভিমুখে পরিচালিত করে। দম্ভ, মাৎসর্য্য, হিংসা, ক্রোধ, কাম, লোভ, মত্ততা, নিষ্ঠুরতা, যশস্কামনা, প্রভুত্বপ্রিয়তা, বৈরনির্য্যাতনেচ্ছা, সম্মানপ্রিয়তা, বিষয়ভোগেচ্ছা, উগ্রতা, অভিমান প্রভৃতি রজোগুণ হইতে উদ্ভূত।

তমঃশক্তি প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাদির দ্বারা আত্মাকে সমাবদ্ধ করে। শোক, প্রমাদ, আলস্য, তন্দ্রা, অবসাদ, বিষাদ, জড়তা, অপ্রসন্নতা, অজ্ঞানতা, চৌর্য্য, তোষামোদ, বঞ্চনা, ভয়, নীচতা, কাপুরুষতা, সেবাবৃত্তি স্ত্রৈণতা, নাস্তিক্য, কৃপণতা, ইত্যাদি তমোগুণের কার্য্য ; তামস ব্যক্তি পার্থিব বিষয়ে অত্যন্ত সমাসক্ত হইয়া পিতৃমাতৃভক্তি, জ্ঞাতিমমতা, ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি সমস্ত উপেক্ষা করিয়া ধনরক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। তমোগুণান্বিত ব্যক্তিগণ যাহা বুঝে সমস্তই প্রকৃতার্থের বিপরীত। উহারা ধর্ম্মকে অধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যকে অকর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য, সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া অবধারণ করে। শাস্ত্র এই জন্য রজঃ ও তমোগুণকে পাপ-শক্তি ও সত্ত্ব গুণকে ধর্ম্ম-শক্তি বলিয়াছেন। রজঃ ও তমঃ শক্তি দ্বারা চিত্তের অধোগতি এবং সত্ত্ব শক্তি দ্বারা চিত্তের উর্দ্ধগতি হইয়া থাকে। তমঃ শক্তির আবির্ভাব সময়ে ভক্তি প্রভৃতি সাত্ত্বিক গুণ প্রকাশ পায় না, অন্তর্দ্দৃষ্টি একে বারে লোপ পায় এবং রজঃশক্তিরও কোনও প্রকার কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয় না। তখন মন মগ্ন হইয়া কোনও বিষয়ের চিন্তা বা অনুধ্যান করিতে পারে না ; তখন অন্তঃ-করণে কেমন একটা জড়তাময় ভাবের আবেশ হয়।

আহার করিলে আমাদের শরীরে পোষণ-শক্তির পরিচালনা হইতে থাকে। ঐ পোষণ-শক্তি তমঃ-শক্তি হইতে উদ্ভূত। কাজেই আহারের পর যখন তমঃ-শক্তির সম্পূর্ণ প্রবল অবস্থা, তখন শরীরে কেমন গুরুত্ব বোধ হয় ; আলস্য অবসাদ প্রভৃতি আসিয়া দেহকে আক্রমণ করে এবং ক্ষণকালের জন্য সত্ত্ব ও রজঃ শক্তিগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আহার না করিলে, এই তমঃ-শক্তির ক্রিয়া হইতে পারে না, রজঃ-শক্তিও অতি ক্ষীণ-ভাবে থাকে, এবং সত্ত্ব শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইতে থাকে। উপবাসের দ্বারা রজস্তমোরূপ পাপ বৃত্তিগুলি নিস্তেজ অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং সত্ত্ব-শক্তির

প্রবুদ্ধ অবস্থা হয়—এজন্য ভবিষ্য পুরাণোক্ত উদ্ধৃত বাক্যে উপবাসের ঐরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

হিন্দুগণ এই জন্য কোনও প্রকার ধর্ম্ম-কার্য্য করিতে হইলে অনাহারে থাকিয়া নিষ্পন্ন করেন। দেবকার্য্যে, শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্যে ও বিবাহাদি সংস্কার কার্য্যে, যাহাতে মনে ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির ভাব আসে এই অভিপ্রায়ে, হিন্দু উপবাস করিয়া থাকেন। উপবাসের দ্বারা রসনেন্দ্রিয় সংযত হয় এবং চিত্ত ঈশ্বরাভিমুখ হওয়াতে ভক্তি প্রভৃতি সদ্বৃত্তিগুলি সঞ্চিত হয়। যিনি দেবোদ্দেশে কি পিত্রুদ্দেশে উপবাস করিয়াছেন, তিনিই এ কথার সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন। যিনি উপবাস করেন, তাঁহার বিষয়তৃষ্ণা অন্ততঃ সে দিনের জন্যও কতকটা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইবে। উপবাসকারী ব্যক্তিকে বাধ্য হইয়া কোনরূপ বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইলেও সর্ব্বদা তাঁহার মনের মধ্যে কি জন্য অনাহারে আছেন তাহা উদিত হওয়ায় মন সর্ব্বদা ঈশ্বরের ভাবে মগ্ন থাকে। যাঁহাদের উপবাসের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা জানেন যে, উপবাস দ্বারা ধ্যান-ধারণায় সাহায্য হয়। কলির মানবগণের পক্ষে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

সর্ব্বার্থদং তপশ্চর্য্যম্ উপবাসঃ কলৌযুগে।

কলিযুগে উপবাসই সর্ব্বার্থসাধন তপস্যা।

দেবীপুরাণে আছে,—

তদ্ধ্যানং তজ্জপঃ স্নানং তৎকথাশ্রবণাদিকম্।
উপবাসকৃতাহ্যেতে গুণাঃ প্রোক্তা মনীষিভিঃ॥

ঈশ্বরের ধ্যান, জপ ও তাঁহার মহিমা শ্রবণ ও স্নানকে উপবাসকারীর গুণ বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ভবিষ্য-পুরাণোক্ত বচনের সহিত এই শ্লোকের কোনও বিরোধ নাই; কারণ ঈশ্বর ধ্যান জপ প্রভৃতি সাত্ত্বিক-ভাবের কার্য্য। ভোজন হইতে

বিরত থাকিয়া সাত্ত্বিক গুণের সহিত বাস করিলেই উপবাস হয়। নিরন্তর অনশন দ্বারা শরীর ক্ষীণ করিতে হইবে, ইহাও শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে। সাময়িক অনশন করিলে শরীর লঘু হয় এবং সত্ত্ব-গুণের প্রকাশ হইয়া রজস্তমোমল বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

উপবাস অল্পাধিক পরিমাণে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত আছে। মুসলমানগণ ও রোমান্ ক্যাথোলিকগণ তাঁহাদের পর্ব্বাদিতে উপবাস করিয়া থাকেন। যাঁহারা উপবাসে অসমর্থ, তাঁহাদের জন্য শাস্ত্র অনুকল্পের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

অনুকল্পো নৃণাং প্রোক্তঃ ক্ষীণানাং বরবর্ণিনি।
মূলং ফলং পয়স্তোয়মুপভোগ্যং ভবেৎ শুভং॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।)

শাস্ত্র, ক্ষীণ ব্যক্তিগণের পক্ষে ফল, মূল, দুগ্ধ ও জল উপভোগের ব্যবস্থা দিয়াছেন। সাময়িক উপবাসের দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, ইহা আধুনিক চিকিৎসকগণও স্বীকার করেন।

লঘ্বাশী ন্যবসীদতি।

লঘু আহারকারী কখনও অবসাদ প্রাপ্ত হন না।

"উপবাস" নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর লিখিয়াছেন,—"উপবাস রোগীর আশ্রয়, ভোগীর রক্ষাকবচ যোগীর সাধন-সহায়।"

প্রকৃতপক্ষে ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের অভিপ্রায়। ব্রত নিয়মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা মনোমল অপসারিত করিয়া মনঃপ্রাণ সমস্ত ঈশ্বরে উৎসর্গ না করিলে কখনই উপাসনা সুসিদ্ধ হয় না।

(৫) স্পর্শেন্দ্রিয়।

স্পর্শেন্দ্রিয়ের যে সকল উপভোগ্য উত্তম উত্তম পদার্থ আছে যদ্দ্বারা মানব বিষয়ে আকৃষ্ট হয় তাহাও পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে ইষ্টদেবতার চরণে অর্পণ করিয়া সাধক ভক্তিভাবে আপ্লুত হইয়া তাঁহার প্রসাদ স্বরূপে উপভোগ করিবেন। আমরা শয্যাসনাদি কোমলস্পর্শ এবং জল, বায়ু, রৌদ্র ও শীতোষ্ণাদি সুখস্পর্শ পদার্থ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকি। আর্য্য-শাস্ত্রে নানা প্রকার আসনের ব্যবস্থা আছে, উপাসনার সময় ঐ সকল আসনে উপবেশন করিতে হয়। ইহাতে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে এবং সঙ্গে ২ আসনাদির অনুরাগও তাঁহার অনুরাগে পরিণত হয়। ঐ সকল আসন তাঁহার উপাসনার অনুরোধে ব্যবহার করিতে হয়; কাজেই তদ্দ্বারা বিষয়ের প্রতি অনুরাগ খর্ব্ব হইয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে থাকে। স্পর্শেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর শয্যা প্রভৃতি সাধক তাঁহাকে ভক্তি ভাবে অর্পণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন; ইহাতে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে অনুরাগ কমিতে থাকে; এজন্য শাস্ত্রে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় স্পর্শেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর পদার্থও তাঁহাকে অর্পণ করার ব্যবস্থা আছে।

অপর জল বায়ু ও রৌদ্রাদি স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ কালে তাঁহার অনুগ্রহ চিহ্ন বা প্রসাদ বলিয়া ভোগ করিতে হইবে। তিনিই সুশীতল সলিল ও সমীরণের অন্তরালে থাকিয়া সকল জীবকে শান্তি প্রদান করেন এবং রৌদ্রাতপের অন্তর্নিহিত থাকিয়া সমস্ত জীবকে রক্ষা করেন, সর্ব্বদা এই তত্ত্ব অনুধ্যান করিতে হইবে। সাধক এই প্রকার অনুধ্যান করিতে করিতে স্পর্শ সুখ ভুলিয়া ভক্তি সুখেরই আস্বাদ করিবেন এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের অনুরাগ তাঁহার অনুরাগে পরিণত হইয়া সাধকের হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইবে; তখন সাধক যে স্থানেই থাকিয়া বায়ু, শীত,

তাপ যাহাই ভোগ করেন না কেন সর্ব্বদাই তাঁহার ভাবে বিভোর থাকিবেন। স্পর্শেন্দ্রিয়ের অনুরাগ তাঁহার অনুরাগে পরিণত করার ইহাই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পন্থা।

সাধক এই প্রকারে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি তাঁহার ইষ্টদেবতাকে অর্পণ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করেন—

যদ্দত্তং ভক্তি ভাবেন পত্রং পুষ্পং ফলং জলং।
আবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং তদ্গৃহাণানুকম্পয়া॥
ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং মন্ত্রহীনং যদর্চ্চিতং।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা ত্বত্তো নান্যা গতির্ম্মম।
অন্তশ্চারেণ ভূতানাং দ্রষ্টী ত্বং পরমেশ্বরি॥
মাতর্যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরব্যয়াস্ত সদাত্বয়ি॥

হে মাতঃ, ভক্তিভাবে পত্র পুষ্প ফল জল যাহা কিছু প্রদত্ত হইল, যে নৈবেদ্য আবেদিত হইল, কৃপা করিয়া তাহা গ্রহণ কর। ভক্তিহীন ক্রিয়াহীন মন্ত্রহীন আমার এই অর্চ্চনা ভক্তিভাবে নিবেদিত হইল; আমার এই সকল পরিপূর্ণ হউক। কি কার্য্যে, কি মনে মনে, কি বাক্যে তুমি ছাড়া আমার আর গতি নাই। হে পরমেশ্বরি, তুমি প্রাণিগণের অন্তরে থাকিয়া সকলই দেখিতেছ। মাগো সহস্র সহস্র যোনিতে পরিভ্রমণ কালে যেখানেই থাকি না কেন, সর্ব্বদাই যেন তোমাতে অচলা ভক্তি অবিকৃত থাকে।

সাধক এই প্রকারে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট উপাসনার পন্থা অবলম্বন করিয়া কর্ম্মের দ্বারা ভক্তি ও ভক্তি দ্বারা জ্ঞান লাভ করতঃ কৃতকৃতার্থ হন। ইহাই হিন্দুর উপাসনার সার তত্ত্ব।

নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করা আমাদের ন্যায় সংসারাবদ্ধ জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব এ জন্য হিন্দুশাস্ত্রানুসারে অধিকারি-ভেদে সকাম ও নিষ্কাম উপাসনার দুইটী স্তর-বিভাগ আছে। যিনি কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া ও কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিশূন্য হইয়া নির্লিপ্তভাবে কর্ম্ম করিতে শিখিয়াছেন, তিনিই নিষ্কাম উপাসনার অধিকারী। আমরা যত দিন পর্য্যন্ত কামনার দাস, তত দিন নিষ্কাম উপাসনার সম্পূর্ণ অনধিকারী।

ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ গীতা ৭।১৬।

হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিই আমার ভজনা করে। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই ত্রিবিধ ভক্ত সকাম, ও জ্ঞানী ভক্ত নিষ্কাম। বিপদে পড়িয়া রক্ষা লাভের জন্য যে ব্যক্তি ভগবানের আরাধনা করেন, তিনি আর্ত্ত ভক্ত। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যাঁহারা ভগবদারাধনা করেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসু। যাঁহারা বিষয় প্রভৃতি ধন প্রাপ্তির নিমিত্ত ভগবানের আরাধনা করেন তাঁহারা অর্থার্থী। আর যিনি ভোগ-ত্যাগী ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত, সেই পুরুষই জ্ঞানী ভক্ত; তিনি সর্ব্বদা ভগবানে আসক্ত থাকেন ও ভগবান্ ভিন্ন অন্য কোনও ফলের আশা করেন না।

পরের শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, এই চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে নিত্য-যুক্ত জ্ঞানী ভক্তই পরম উৎকৃষ্ট; এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভক্ত আর নাই। বাস্তবিক এই প্রকার মহাত্মাই নিষ্কাম ভক্ত। আর্ত্ত ভক্ত পীড়া মুক্তির জন্য, জিজ্ঞাসু ভক্ত তত্ত্বজ্ঞানের জন্য ও অর্থার্থী ভক্ত বিষয়-লাভের জন্য তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন; কিন্তু যিনি নিত্যযুক্ত অর্থাৎ যিনি ভগবান্ ভিন্ন আর কিছু দেখেন না—আর কিছু জানেন না—আর কিছু

ভাবেন না, তিনিই প্রকৃত নিষ্কাম-সেবার উপযোগী। যে কাল পর্য্যন্ত সাধক এই প্রকার উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত না হন, সে কাল পর্য্যন্ত কামনা-বিরহিত হইয়া আরাধনা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। যাঁহার চিত্তে কামনারাশি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তিনি কামনা নিয়াই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন, তাহাতেই তিনি সম্পূর্ণ ফল লাভ করিবেন। যে কোনও প্রকারে তাঁহাতে মন নিবিষ্ট করিতে পারিলেই হইল। তোমার চিত্ত যাহা চাহে, তাহা প্রার্থনা করিয়াই তাঁহাকে ডাকিতে থাক, তাহাতেই তন্ময়তা লাভ করিবে।

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদ্যমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥

কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য, সৌহার্দ্দ্য, ইহার দ্বারাও যিনি সর্ব্বদোষহারী শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই তন্ময়তা প্রাপ্ত হন।

হৈতুকী (অর্থাৎ সকাম) ভক্তি হইতেই অহৈতুকী (নিষ্কাম) ভক্তি লাভ করা যায়। ধ্রুব ইহার একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তিনি রাজ্য-লাভের প্রার্থনা করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত হন। পরে যখন ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর দিতে আসেন, তখন বলিলেন,—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং নযাচে॥

ভক্তিসুধোদয়।

রাজ্যের অভিলাষী হইয়া আমি সাধনা করিয়াছিলাম বটে; কিন্তু যখন আমি সামান্য কাচ অন্বেষণ করিতে গিয়া মাণিক পাইলাম, তখন হে প্রভো, আমার আর অন্য বরের প্রার্থনা নাই।

যাহাদের হৃদয়ে কামনারাশি পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতেছে, তাহাদের পক্ষে কামনা বর্জ্জন করা কখনও সম্ভবপর নহে। কামনার জন্যই তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। আর্ত্ত কি অর্থার্থী হইয়া তাঁহার শরণাগত হইলে ক্রমে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইবে। তখন কামনা-রাশি আপনা হইতেই তিরোহিত হইবে।

অন্য কামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে।
কাম ছাড়ি দাস হতে হয় অভিলাষে॥

প্রথমেই অহৈতুকী পরা ভক্তি কেহ লাভ করিতে পারে না। কামনার লেশ মাত্র থাকিলেও পরা ভক্তির অবস্থা আসিতে পারে না। উপাসনার প্রথম স্তর সকাম উপাসনা। আমার হৃদয়ের যাহা প্রিয় বস্তু, যাহার জন্য আমি সর্ব্বদা লালায়িত, তাহা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। আমার হৃদয়ে নানা প্রকার বাসনা, অথচ আমি মুখে বলিতেছি,—প্রভো! আমি কিছুই চাহি না, কেবল ভক্তি চাই; ইহাতে তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তি জন্মিতে পারে না; কারণ, আমার হৃদয় যে বস্তুর দ্বারা আকৃষ্ট, সেই বস্তু পাওয়ার জন্য তাঁহাকে ডাকিলে তবে ঐকান্তিক ভাব আসিবে—তবে পরাভক্তির উদয় হইবে ও কামনা ছুটিয়া যাইবে। ধ্রুবের ঠিক এই অবস্থাই হইয়াছিল। রাজ্যলাভের জন্য ইষ্টদেবকে ডাকিতে ডাকিতে যখন ইষ্টদেব উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি বলিলেন,—'প্রভো! আমি কিছুই চাহি না, আমার আর কামনা নাই।'

ভগবান্ গীতাতেও সাধনার এইরূপ ক্রমিক স্তর বর্ণনা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি কখনও তাঁহার উপাসনা করে নাই, সেও রোগাদি বিপদ্ হইতে মুক্তি লাভের জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হয়; ক্রমে তাহার বিষয়-

বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে। এই প্রকারে তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে ক্রমে জিজ্ঞাসুর অবস্থা উপস্থিত হয়। অবশ্য এ প্রকার অবস্থা আমাদের মত জীবের এক জন্মে লাভ হইবার নহে; কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। যিনি যে ভাবেই ডাকুন, তাঁহার প্রভাবে ক্রমে চিত্তের কামনাবৃত্তি গুলি দূর হইয়া ভক্তির উদ্রেক হইবে। এ বিষয়ে শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে।

শাস্ত্রে পরা-ভক্তির এই প্রকার ব্যাখ্যা আছে,—

হেতুস্তু তত্র কো বাপি ন কদাচিদ্ ভবেদপি।
সামীপ্যসার্ষ্টিসাযুজ্যসালোক্যানাং ন চৈষণা॥
মৎ সেবাতোঽধিকং কিঞ্চিন্নৈব জানাতি কর্হিচিৎ।
সেব্যসেবকতাভাবাত্তত্র মোক্ষং ন বাঞ্ছতি॥

দেবীভাগবতম্, ৭।১৩।১৩-১৪।

কিন্তু তাহাতে কোনও প্রকার হেতু অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা এমন কি সামীপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য ও সালোক্যাদি মুক্তি কামনা বিদ্যমান থাকে না। যে ব্যক্তি কেবল প্রেমপূর্ণ হইয়া আমারই আরাধনা করিয়া থাকে যে ব্যক্তি আমার সেবা অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট আর দ্বিতীয় জানে না, যে ব্যক্তি সেব্য ও সেবক ভাব পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষ বাঞ্ছাও করে না। আমি তাঁহাকে কেন ভালবাসি, জানি না। আমার ভালবাসিতে ইচ্ছা হয় বলিয়াই ভালবাসি। এ ভালবাসার কোনও হেতু নাই; এই জন্য ইহাকে অহৈতুকী ভক্তি বলে।

এই ভক্তির যখন পরাকাষ্ঠা হয়, তখন তাহা জ্ঞান নামে অভিহিত। এই জ্ঞান হইতে মুক্তি লাভ হয়।

ভক্তেস্তু যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতম্।

দেবীভাগবতম্, ৭।৩৭।২৮।

ভক্তির চরম অবস্থাকেই জ্ঞান কহে।

জ্ঞানান্ মুক্তির্ন চান্যথা।

দেবীভাগবতম্, ৭।৩৭।৬০।

জ্ঞান ব্যতিরেকে আর কিছুতেই মুক্তি লাভ হয় না। এই জ্ঞান কাহারও এক জন্মে লাভ হয় না, তদর্থে বহু জন্মের সাধনা আবশ্যক।

অনেকজন্মভী রাজন্! জ্ঞানং স্যান্নৈকজন্মনা।

ততঃ সর্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞানার্থং যত্নমাশ্রয়েৎ॥

দেবীভাগবতম্, ৭।৩৭।৩৮।

গিরিরাজ! অনেক জন্ম দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়, এক জন্মে তাহা লাভ হয় না; অতএব জ্ঞান লাভের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

কাজেই আমরা সকাম সাধক বলিয়া আমাদের নিরাশ হওয়ার কোনও কারণ নাই। আমরা নিজে সকাম, কাজেই আমাদের সাধনাও সকাম হইবে। যখন কামনা হৃদয় হইতে দূর হইবে, তখন আমরা নিষ্কাম সাধক হইতে পারিব এবং তখনই পরা-ভক্তির উদয় হইবে। ঐ পরা ভক্তি জ্ঞানে পরিণত হইয়া মুক্তি প্রদান করিবে। এইরূপ সোপান-পরম্পরা অবলম্বন করিয়া ক্রমে উচ্চে উঠিতে হইবে। চণ্ডীতেও এই ক্রম-পরম্পরার প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রথম সকাম উপাসনার বিধি দিয়াছেন। অর্গলা স্তোত্রে নানা প্রকার কামনায় প্রার্থনা আছে,—

দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

ইহাই গীতোক্ত অর্থার্থীর প্রার্থনা।

হিন্দু শাস্ত্রে অধিকারিভেদে এইরূপে সকাম (বা হৈতুকী) ও নিষ্কাম (বা অহৈতুকী) উপাসনার বিধি আছে। যাঁহার যে প্রকার চিত্ত-বৃত্তি,

তাঁহার হৃদয়প্রদেশ হইতে সেই প্রকার প্রার্থনা উঠিবে; কাজেই যিনি যে প্রকার প্রকৃতিসম্পন্ন, তাঁহার উপাসনাও সেই প্রকারের হইবে। সকাম উপাসনা করিতে করিতে সাধকের চিত্ত-বৃত্তি ক্রমশঃ নির্ম্মল হইতে থাকে এবং ভোগ-বাসনাও আপনা হইতে ক্ষীণ হইয়া যায়। পরিশেষে শুভাশুভ ফলের প্রতি আর লক্ষ্য থাকে না, অনন্যা পরা-ভক্তি লাভ করিয়া সাধক পরব্রহ্মে লীন হন। সকাম পুরুষও এইরূপ জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অবশ্য বহু জন্মের সাধনার প্রয়োজন। ভগবান্ গীতায় দেবীভাগবতের কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন,—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ। গীতা—৭। ১৯।

জন্মে জন্মে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া বহু জন্মের পর জ্ঞানবান ব্যক্তি ভগবৎপ্রেমে বিহ্বল হইয়া সমস্তই ভগবন্ময় দর্শন করেন। এইরূপ ব্যক্তি অতি দুর্লভ।

শাস্ত্রে যে সকল সকাম কর্ম্মের উল্লেখ আছে, সেই সকল কর্ম্মের ফলের প্রতি আসক্তি দৃঢ়ীভূত করা, শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রোল্লিখিত সদাচার ও ব্রত, তপস্যা, যাগ যজ্ঞ দ্বারা চিত্তের মোহ ও বিষয়-বাসনা সকল ক্ষীণ হইয়া সত্ত্বৃত্তি সকলের উদয় ও বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপে চিত্ত শুদ্ধি লাভ করিলে মোক্ষলাভের জন্য মানবের আকাঙ্ক্ষা জন্মিতে থাকে এবং ক্রমশঃ মুক্তির অন্তরায় অহং-বৃত্তি সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ স্বয়ং উদ্ধবকে এই প্রকারে উপদেশ দিয়াছিলেন।

বেদে যে সকল ফলশ্রুতির উল্লেখ আছে, তাহাই জীবের পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া প্রদর্শন করা বেদের উদ্দেশ্য নহে। ইহা মোক্ষ ধর্ম্মে রুচি

জন্মাইবার নিমিত্ত মাত্র। পরম শ্রেয়ঃ যে মোক্ষ, তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই এই সকল উক্ত হইয়াছে। যেমন চিকিৎসকেরা রোগীর প্রীতি জন্মাইবার নিমিত্ত ঔষধের সহিত সুরস বস্তু মিশ্রিত করেন, কিন্তু সুরস বস্তু খাওয়াইয়া প্রীতি জন্মানই উদ্দেশ্য নহে; তদ্রূপ স্বর্গাদি ফল দেওয়াই বেদের উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু মোক্ষাভিমুখ করাই উদ্দেশ্য। জীব সকল স্বীয় উৎপত্তির সহিত স্বভাবতঃ আয়ু এবং পুত্র-কলত্রাদি স্বজন, যাহা তাহার স্বীয় অনর্থের হেতু, তৎপ্রতি আসক্তি-সম্পন্ন হয়। স্বীয় যথার্থ স্বার্থ বিষয়ে উদাসীন। দুঃখ মার্গে ভাসমান, অন্ধমতে নিপতিত, এই সকল পুরুষ বেদ-মার্গাধীন হইলে সর্ব্বজ্ঞ বেদ পুনরায় তাহাদিগকে কি নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত কাম্য বিষয় সকলে নিয়োজিত করিবেন? (শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১১। ২১।)

কর্ম্মকাণ্ডের শেষাবস্থাই জ্ঞানকাণ্ড,—ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রপ্রতিপাদিত সত্য। আমাদের লক্ষ্য অহৈতুকী ভক্তি সত্য; কিন্তু যাহার পূর্ণ মাত্রায় "অহং" জ্ঞান রহিয়াছে এবং যাহার চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ বহির্ম্মুখী, তাহার অহৈতুকী ভক্তি কিরূপে লাভ হইবে? কামনার বশবর্ত্তী হইয়া আমার প্রিয়তম কামনা লাভের জন্য তাঁহাকে ডাকিলে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হইবে না।

কৃষ্ণ কহে আমা ভ'জে মাগে বিষয় সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এত বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় [illegible] দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥

আমাদের ন্যায় যাহারা কামনার দাস, তাহাদের প্রথমে নিজের স্বার্থ ভিন্ন অন্য প্রার্থনা কিছু থাকে না। পরে তাঁহাকে সকাম ভাবে

ডাকিতে ডাকিতে অনুরাগের ভাব আসে এবং "কাম ছাড়ি দাস হইতে" অভিলাষ জন্মিয়া থাকে।

পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন,—"সাধন করিতে করিতে এগিয়ে যাও, রত্ন দেখিতে পাইবে।" এই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সাধন-পথে ধীরে ধীরে বিধিনির্দ্দিষ্ট উপায়ে অগ্রসর হইতে হইবে। একেবারে জনক রাজা হওয়া যায় না; সাধন পথে সোপান-পরম্পরায় অগ্রসর হইলে, তবে নিষ্কাম ভক্ত হইতে পারা যায়। প্রকৃতি অনুসারে সাধনার প্রকারভেদ অপরিহার্য্য। সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে সাধন করিলে ক্রমে চিত্ত নির্ম্মল হইয়া আসিবে এবং অবশেষে সমস্ত শাস্ত্রের সার লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধি লাভ হইবে। তখন সমস্ত কামনা ধ্বংস হইলে আত্ম-সাক্ষাৎকার হইবে। যে কাল পর্য্যন্ত কামনারাশি থাকিবে সে কাল পর্য্যন্ত বার বার জন্ম মৃত্যু ঘটিবে এবং সংসার পরিভ্রমণ করিতে হইবে।

হিন্দুর উপাসনার উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের কামনা-রাশিকে ধ্বংস করিয়া চিত্তকে নির্ম্মল করা। কারণ, চিত্ত শুদ্ধ না হইলে আত্ম-সাক্ষাৎকার সংঘটিত হইতে পারে না। যত দিন কামনা থাকিবে, তত দিন আত্মজ্ঞান বা শাস্ত্রীয় ব্রহ্মজ্ঞান সুদূরপরাহত। ইহাই সর্ব্ব-শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত। সাধকও তাহাই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

যাঁহা কাম তাঁহা রাম নহি, যাঁহা রাম তাঁহা নহি কাম।
দোনো একত্র নহি মিলে রবি রজনী এক ঠাম॥

দ্বিতীয় ভাগ সম্পূর্ণ।

ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে কতিপয়

পত্রিকার মতামত।

হিন্দু পত্রিকা—"এই ক্ষুদ্র পুস্তকে গ্রন্থকার অনেক উপাদেয় তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি ঈশ্বরের নির্গুণ ভাব, সগুণ ভাব, সাকারোপাসনা, হিন্দু পৌত্তলিক কিনা এবং হিন্দু নানা ঈশ্বরের পূজক কিনা ইত্যাদি বিষয়ের গভীর আলোচনা ও সুমীমাংসা করিয়াছেন। শাস্ত্রের সাহায্যে গ্রন্থকার প্রধানতঃ তাঁহার প্রতিপাদ্য জটিলতত্ত্ব সমূহের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই ক্ষুদ্র চেষ্টায় তাঁহার বেশ কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, এ পুস্তক প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর নিকট আদৃত হওয়া উচিত।"

ভারতবর্ষ—"ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ, যুক্তি প্রভৃতি এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। বিষয়টি গুরুতর; এ সম্বন্ধে সমস্ত শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। শ্রীযুক্ত কালীচরণ বাবু এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সেই চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য তিনি সকল কথা বিশদ করিয়া বলিবার অবকাশ লাভ করেন নাই; কিন্তু এত ছোট একখানি বইয়ের মধ্যে যতটুকু বলা যাইতে পারে, তিনি তাহার ত্রুটী করেন নাই। এ শ্রেণীর পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।"

হিন্দু রঞ্জিকা—[illegible] পুস্তক প্রত্যেক হিন্দুর পাঠ করা উচিত। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীও যদি [illegible] ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম জানিতে চান তবে এই পুস্তকখানি পাঠ করিলেই [illegible]নিতে পারিবেন।"

কাশীপুর নিবাসী—"পুস্তকখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে হিন্দু ধর্ম্মকে যাহারা Idolatry আখ্যা প্রদান করেন তাহারা কতদুর ভ্রান্ত। বাবু কালীচরণ সেন মহাশয় গৌহাটী নগরের গভর্ণমেণ্ট প্লীডার।"

সাহিত্য-সংবাদ—"গৌহাটী-সনাতন-ধর্ম্মসভার প্রকাশিত তিন খণ্ড পুস্তিকা আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। দুই খণ্ডের প্রণেতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয়। অপর খণ্ড—সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বি এল মহাশয়ের লিখিত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রতিষ্ঠান্বিত লেখক। কিন্তু সেন মহাশয় সাহিত্য-সংসারে নূতন পদার্পণ করিয়াও যে অনুসন্ধিৎসা, যে পাণ্ডিত্য, যে মহান্ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তাঁহার পুস্তিকার নাম—'ঈশ্বরের স্বরূপ'। অল্পের মধ্যে সরল ভাবে সেই গভীর দার্শনিক তত্ত্ব তিনি কি সুন্দরই বুঝাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থখানি আগাগোড়া 'সাহিত্য-সংবাদে' উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা হয়।"